পূর্ণিয়ার ইতিবৃত্ত।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীভবানন্দ সিংহ

প্রণীত ও প্রকাশিত।

খানাবাড়ী।

(পূর্ণিয়া।)

সন ১৩১৫ সাল

২রা চৈত্র।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

খানা- জী নিবাসী সিংহবংশীয়গণের বংশক্রম।
নরপতি
মহীদাস পাল
ক্ষিতি পাল
নির্ভর সিংহ

পূর্ণিয়ার ইতিবৃত্ত।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীভবানন্দ সিংহ

প্রণীত ও প্রকাশিত।

খানাবাড়ী।

(পূর্ণিয়া।)

সন ১৩১৫ সাল

২রা চৈত্র।

মূল্য ৷০ আনা মাত্র।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু শেষলাল সিংহ

অগ্রজ মহাশয়ের

পবিত্র করকমলে

আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত

পূর্ণিয়ার ইতিবৃত্ত

উৎসর্গীকৃত

হইল।

ভূমিকা।

বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ মুসল্‌মান রাজধানী মুর্শিদাবাদের বহু রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত পূর্ণিয়ার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। পূর্ণিয়ার বিস্তৃত ইতিহাস দেখা যায় না। এই অভাব পূরণকল্পে আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি সমস্তই নিয়োজিত করিয়াছি। ৪ বৎসরের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে আমি পূর্ণিয়ার ইতিহাস সঙ্কলন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি। ইহার সঙ্কলন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে অনেক বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারসী, আসামীয় ও নেপালী গ্রন্থাদি এবং পুরাতন কাগজপত্র সংগ্রহ ও পাঠ করিতে হয় এবং বহু আয়াস স্বীকার করিয়া পূর্ণিয়ার নানাস্থান পর্য্যটন করিতে হয় এবং এই জেলার বহু প্রাচীন কীর্ত্তি পরিদর্শন ও পর্য্যালোচনা করিতে হইয়াছে। পূর্ণিয় ও কিশনগঞ্জের প্রসিদ্ধ মোক্তার স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার বাবু বিভূতি ভূষণ মজুমদার মহাশয়ের উৎসাহ ও পরিশ্রমে আমি এত শীঘ্র এই ইতিবৃত্ত সঙ্কলন কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হইয়াছি। এজন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমার বহু যত্নার্জ্জিত এই পূর্ণিয়ার ইতিবৃত্ত এক্ষণে জনসাধারণের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিলে আমার ব্যয়, পরিশ্রম ও সময় সার্থক জ্ঞান করিব। এ গ্রন্থে কোন কোন স্থানে ভ্রম ও ত্রুটী লক্ষিত হইলে পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

খানাবাড়ী, পূর্ণিয়া।
১৩১৫। ২রা চৈত্র।

গ্রন্থকার।

পূর্ণিয়ার ইতিবৃত্ত।

প্রথম অধ্যায়।
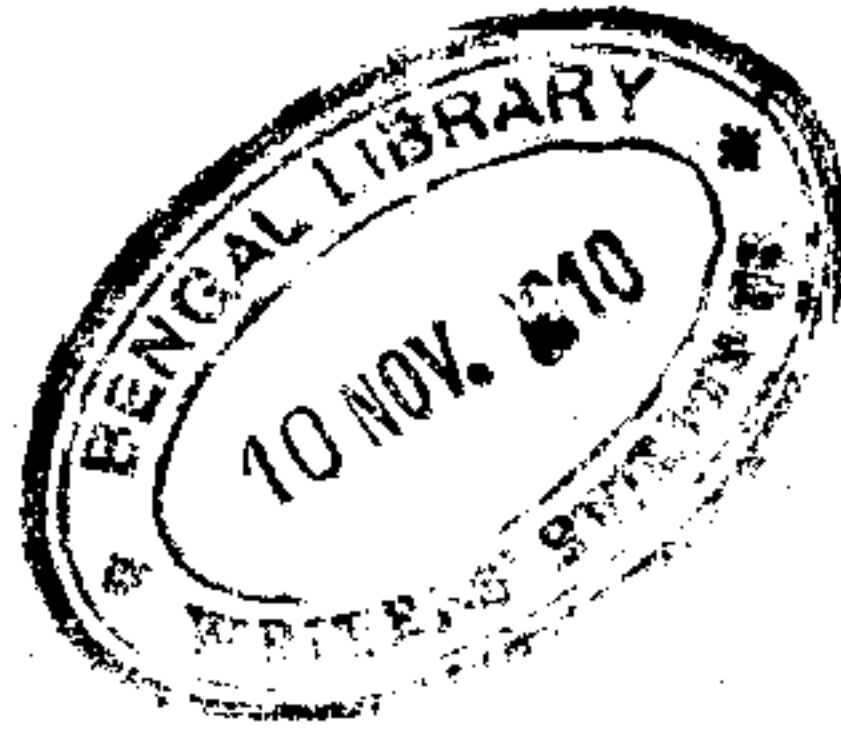
প্রাকৃতিক বিবরণ।

পূর্ণিয়া জেলার উত্তর সীমা নেপালরাজ্য ও দারজিলিং, পূর্ব্বে নাগরনদী ইহাকে জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও মালদহ হইতে পৃথক করিতেছে, দক্ষিণে গঙ্গা ও পশ্চিমে কুশীনদী ইহাকে ভাগলপুর জেলা হইতে পৃথক করিতেছে। এই সীমান্তর্গত ভূভাগের পরিমাণ ফল প্রায় ৫০০০ বর্গ মাইল এবং অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ।

পূর্ণিয়া নামটি আধুনিক। পূর্ব্বে ইহার এ নাম ও সীমা ছিল না। জনশ্রুতি এই যে "মুসলমান অধিকারের বহু পূর্ব্বে বর্ত্তমান পূর্ণিয়া সহরে পূরণচাঁদ নামে এক হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল। সেই পূরণচাঁদের নাম হইতে সহরের নাম পূর্ণিয়া হইয়াছিল। এবং ইংরাজ অধিকারে তাহা হইতে জেলার নাম করণ হইয়াছে।" কিন্তু লিখিত কাগজ পত্রে ইহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পূরণচাঁদ কে এবং কোন্ সময়ে এতদঞ্চলে রাজত্ব করিতেন তাহারও কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। লিখিত কাগজ

পত্রের মধ্যে খৃষ্টের ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রণীত আবুল ফজলের আইন-ই আক্‌বরী গ্রন্থে "সরকার পূরণীয়া" নাম দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। ইহাতে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে আইন-ই আক্‌বরী গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্ব্বে পূরণীয়া নাম হইয়াছিল। মুসলমান অধিকারের সূত্রপাতের সময় উত্তর বাঙ্গালায় এক প্রকার প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। তাহা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার সন্ধিস্থল। সাধারণ লোকে ইহাকে ব্রজবুলি বা মৈথিলি ভাষা কহে। পূরণীয়া শব্দ সেই প্রাকৃত ভাষার "পূর" ও "ণীয়া" শব্দ হইতে গঠিত হইয়াছে। পূরণীয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা বা অধিকার করা। পূর্ণীয়া শব্দ সেই পূরণীয়া শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

নেপালের সন্নিহিত অত্যল্পস্থান ব্যতীত পূর্ণীয়া জেলার সমগ্র ভূমি সমতল ও বালুকাময়। এই সমতল বালুকাময় ভূভাগ উত্তরাংশের উচ্চ ভূভাগের মত প্রাচীন নহে। নদী আনিত বালুকাস্তরেই এ জেলার দক্ষিণাংশের উৎপত্তি হইয়াছে। এক্ষণে প্রাচীন নগর, সরোবর, দুর্গের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি প্রাচীনত্বের চিহ্ন অধিকাংশই এ জেলার উত্তরাংশে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইউরোপীয় ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্ণীয়া জেলার বালুকাময় ভূমির অতি নিম্নে প্রস্তরময় স্তর আছে। উহা অতি পূর্ব্বে জলমগ্ন ছিল। পরিশেষে কালপরিবর্ত্তনে ভূখণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এই কঠিন প্রস্তরময় স্তর নেপালের নিকটস্থ হিমালয় পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ নিম্নগামী হইয়া আবার গঙ্গার দক্ষিণ পারে রাজমহল ও সাহেবগঞ্জের নিকট পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াছে। বাস্তবিক পূর্ণীয়া জেলা নেপাল ও সাহেবগঞ্জ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তীর উপত্যকা (টেরাই) মাত্র। এই ভূভাগ সমুদ্র পৃষ্ঠ (Sea level) হইতে ২৭ ফিটের অধিক উচ্চ নহে। এই জন্য এ অঞ্চলে ৭। ৮ হাত খনন করিলেই জল পাওয়া যায়।

পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক নদী প্রবাহিত হওয়ায় ইহার ভূমি বালুকাময় হইলেও অতিশয় উর্ব্বরা। অল্প আয়াস ও পরিশ্রমে অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। অল্প বৃষ্টি হইলে শস্য উৎপাদনের তত

এ জেলার নদী সমূহকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) কুশী ও তাহার শাখা কালীকুশী, সেওড়া ও নাগরধার। (২) পনার ও তৎশাখা পরয়ান। (৩) মহানন্দা ও তাহার শাখা ও উপনদী নাগর, বুড়ীমারী, পিতান্থু, ডক, কনকাই, মেচী, চেঙ্গা, রমজান ও স্থধানি। এই সকল নদী বরাবর একস্থান দিয়া প্রবাহিত থাকে না। প্রায়ই নদীর স্রোতের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মেচী নদী বর্ত্তমান ঠাকুরগঞ্জের নিকট দিয়া প্রবাহিত ছিল। এক্ষণে সেস্থান হইতে প্রায় ৭। ৮ মাইল পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে। রমজান পূর্ব্বে একটি বেগবতী স্রোতস্বতী ছিল এক্ষণে ক্ষীণকায় স্বল্পতোয় হইয়া স্থানে স্থানে স্রোতবিহীন দীর্ঘিকায় পরিণত হইয়া রহিয়াছে। কুশী একটি বিখ্যাত বেগবতী স্রোতস্বতী। ইহা অতি পূর্ব্বে পূর্ণিয়া সহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বর্ত্তমান বারসোই গ্রামের নিকট মহানন্দার সহিত মিলিত হইয়া মালদহের উত্তর ও রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া করতোয়ার সহিত সম্মিলিত হইয়া আত্রেয়ী নাম ধারণ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ কুশীর স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া পূর্ণিয়া জেলার পশ্চিম সীমা দিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং মহানন্দাও বারসোই হইতে বরাবর দক্ষিণাভিমুখী হইয়া প্রাচীন গৌড়ের পশ্চিম দিয়া গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। ১৮১১ সালে ডাক্তার বুচানন হামিণ্টন সাহেব এতদঞ্চলের যে বিবরণী লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি এই বিষয় বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের বিবরণী লেখক স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হণ্টার সাহেবও এবিষয়ের পোষকতা করিয়াছেন। *

---

* We have evidence that this river Kusi passed below the town of Purneah, and thence due south to the Ganges ... ... Where the original bed of the Kusi was, it is nearly impossible to state. Dr. Buchanan Hamilton also admits that the pundits or learned men, who inhabit its banks, refer to a period of remote antiquity, when the Kusi had no connection with

পূর্ণিয়া জেলায় সাধারণতঃ শীত ও বর্ষা এই দুই ঋতুর আধিক্য দেখা যায়। হিমালয়ের সন্নিহিত বলিয়া শীতের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। অক্টোবর মাস হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত শীত থাকে। জুন মাসের শেষ হইতে আরম্ভ হইয়া সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বর্ষা। সমগ্র বর্ষাকালে গড়ে অন্যূন ৬৫ ইঞ্চি বৃষ্টি পতিত হয়, জুন ও জুলাই মাসে দিনের বেলায় বালুকা উত্তপ্ত হইলে গ্রীষ্ম অনুভূত হয় কিন্তু রাত্রে শীত বোধ হয়। বর্ষাকালে পূর্ব্বদিক হইতে বায়ু বহিয়া থাকে। এই বায়ু জলীয় বাষ্পে পরিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর। শীতের সময় পশ্চিম দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। উত্তর বা দক্ষিণ দিক হইতে বায়ুপ্রবাহ এতদঞ্চলে অপরিজ্ঞাত।

পূর্ণিয়া জেলার জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রবাদ আছে। কিন্তু বৎসর ব্যাপিয়া এরূপ অস্বাস্থ্যকর থাকে না। বর্ষার পর হইতে আরম্ভ হইয়া ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত এ জেলায় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ দেখা যায়। কিন্তু অন্য সময় ইহা স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যকর থাকে। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব অধিক হইলেও এখানে মৃত্যু সংখ্যা তত অধিক নয়। পূর্ব্বে পূর্ণিয়ার জলবায়ু এরূপ ম্যালেরিয়া পূর্ণ ছিল না। নদীর স্রোত পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ও পূর্ব্বস্থান প্রবাহিত খাদ স্রোতবিহীন জলাভূমিতে পরিণত হওয়ায় এবং রেলপথ প্রভৃতি প্রস্তুত হওয়ায় জল নিষ্কাশনের পথ সকল অবরুদ্ধ হওয়াতে বর্ষার সঞ্চিত জল বালুকাময় ভূমিতে প্রবেশ করতঃ কূপ ও ইন্দারাস্থিত পানীয় জল দূষিত করে। সুতরাং বর্ষার শেষে উহা ম্যালেরিয়ারূপে স্বীয় প্রাদুর্ভাব প্রকাশ করে। যখন

---

eastward through the present Purguna of Tazpore and the south of the present District of Dinajpore and Rangpore to join the Brahmaputra in the east of Bengal. Dr. Buchanan Hamilton regards this tradition as highly probable, and thinks it not unlikely that the great chain of lakes and marshes, north and east of Maldaha, are the remains of a great river bed formed by the united Kusi and Mahananda.—Dr: W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal Vol XV PP 231 & 232

কুশী পূর্ণিয়া সহরের নিকট দিয়া প্রবাহিত ছিল, তখন মুসলমান নবাবেরা পূর্ণিয়া সহরের নিকট রামবাগ, বেগমদেউড়ি, খুসকীবাগ প্রভৃতি স্থানে আপনাদের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দাওয়ানী ভার প্রাপ্ত হইবার পর ঐ সকল স্থানে আপনাদের কাছারি ও সৈন্ত নিবাস সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কুশীর স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া পূর্ণিয়ার পশ্চিম সীমা দিয়া প্রবাহিত হইলে পূর্ণিয়া সহরের নিকটস্থ কুশীর পুরাতন খাদ অস্বাস্থ্যকর জলাভূমিতে পরিণত হইয়া এরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে যে ১৮২০ সালে ইংরাজ কোম্পানি ঐস্থান হইতে সৈন্ত নিবাস স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হন। এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে দাওয়ানি ও ফৌজদারি কাছারি মধুবানিতে স্থানান্তরিত করেন। অতি পূর্ব্বে পূর্ণিয়ার জল বায়ু বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা উত্তম থাকিলেও গলগণ্ড এখানকার প্রধান রোগ ছিল। এখানকার নদীর জলে ঐ রোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে লোকে কূপ খনন করিয়া তাহার জল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করায় ঐ গলগণ্ড রোগেরও হ্রাস হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আদিম অধিবাসী। আর্য্যাধিকার।

আর্য্য হিন্দুগণের অধিকারের পূর্ব্বে এদেশে যখন ভিল, কুকি, কোচ, কোল প্রভৃতি অনার্য্য জাতির বাসস্থান ছিল, বোধ হয় সে সময় এই পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণ ভাগ জলমগ্ন থাকায় মনুষ্য আবাসের অযোগ্য ছিল। এবং উচ্চ উত্তরাংশ সে সময় অনার্য্য জাতির আবাস ভূমি ছিল। উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণাংশের আধুনিকতার প্রমাণ প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। আর্য্যগণ ঐ সকল অনার্য্য জাতিদিগকে দূরীভূত করিয়া দিয়া এ প্রদেশে আপনাদের অধিকার ও বাস স্থাপন করেন। আর্য্যক্ষত্রিয়গণের এদেশে অধিকার বিস্তৃত

জঙ্গল ও পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পূর্ণিয়া জেলার উত্তর পূর্ব্ব ভোট ও আসামের পর্ব্বত ও জঙ্গলে এখনও এই সকল ভিল, কুকী প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোচ, কোল, পোলিয়া, কাঞ্জর ও নট প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিজেতা আর্য্যদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়া এদেশে বাস করিয়াছিল। এদেশে অধুনা যে সকল রাজবংশী, গণগাই, কোচ, কোল, নট, পোলিয়া ও কাঞ্জর প্রভৃতি লোকদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় ইহারাই সেই আদিম অধিবাসীর সন্তান। ইহাদের আকৃতিগত. বৈলক্ষণ্য (উন্নত হনু high cheek bone ও চেপটা নাসিকা flat nose) দেখিলে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, ইহারা ককেসিয় জাতীয় মনুষ্য নহে। আবার এই বিজেতা আর্য্যও জিত অনার্য্য জাতির মিশ্রণে কাল সহকারে অনেক বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। আজ কাল এদেশ মধ্যে যে মুশহর, ডোম, বাগ্‌দী, মাঝি, দোসাদ বেলদার, নুনিয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগকেই এই বর্ণসঙ্কর জাতি বলিয়া প্রতীত হয়।

কোন্ সময় যে এ দেশে আর্য্য অধিকার প্রথম বিস্তৃত হয় তাহা নিরাকরণ করা দুরূহ। আর্য্য হিন্দুগণের ভারতবর্ষে প্রবেশের ও সরস্বতী নদী তীরে উপনিবেশ সংস্থাপনের পর যে তাঁহারা গাঙ্গ প্রদেশ বিজয়ার্থ পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। আর্য্যগণের সদানীর নদী পার পর্য্যন্ত দিগ্‌বিজয়ের এক বিবরণ শতপথ ব্রাহ্মণে (১ম-৪) দেখিতে পাওয়া যায়। যখন বিদেহরাজের কুলপুরোহিত গৌতম ঋষি অগ্নি বৈশ্বানরকে আহ্বান করেন তখন রাজার মুখ হইতে অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া ভূমিস্পৃষ্ট হইবা মাত্র বৃক্ষাদি দহন করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইতে থাকেন এবং বিদেহরাজ ও গৌতম ঋষি তদনুবর্ত্তী হন। অগ্নি অরণ্য ও নদ নদী দহন করিতে করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু হিমালয় নিস্থত সদানীর নদী দহন করিতে সক্ষম হন নাই।

ইহাতে দেখা যায় যে বিদেহ রাজের সময় আর্য্যগণ সিন্ধু হইতে সদানীর

ব্রাহ্মণে লিখিত সদানীর নদী কোন্‌টি। পূর্ণিয়ার ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট জজ পরে হাইকোর্ট জজ মিঃ পার্জিটর সাহেব স্বলিখিত "প্রাচীন হিন্দুরাজ্য" * নামক ইংরাজি পুস্তিকায় বলেন যে বর্ত্তমান গণ্ডক নদীই শতপথ ব্রাহ্মণোক্ত সদানীর। কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণের টীকাকার সায়নাচার্য্য সদানীরকে করতোয়া নদী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সদানীর শব্দে যাহাতে সর্ব্বদা অর্থাৎ বৎসরের সকল সময়ই জল থাকে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে করতোয়া আর সদানীর সমান অর্থবাচক। বর্ত্তমান করতোয়া শতপথ ব্রাহ্মণোক্ত যে সদানীর তাহা পণ্ডিত রঘুনন্দন সংগৃহীত করতোয়ার স্তোত্রে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। † যাহা হউক যে সময়েই হউক আর্য্যেরা অনার্য্য জাতিদিগকে পরাজয় করিয়া সিন্ধু হইতে করতোয়া পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

পূর্ণিয়ার উত্তর সীমা অতিক্রম করিয়া নেপাল রাজ্যের মধ্যে প্রায় ১০। ১২ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে বরাহছত্রে গমন করা যায়। এই বরাহছত্রে প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণীমার দিন একটি মেলা হয়। তদুপলক্ষে তথায় বহুতর যাত্রী ও সন্ন্যাসির সমাগম হইয়া থাকে। একটি ক্ষুদ্র গিরিনদীর নিকট পর্ব্বত গহ্বরে ভগবানের বরাহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। জনশ্রুতি এই যে ইহার অদূরে হিরণ্যাক্ষের আবাস ভূমি ছিল। ভগবান বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই গহ্বরের মধ্য দিয়া গমন করতঃ পাতাল মধ্যে হিরণাক্ষ দৈত্যকে বধ করেন, সেইজন্য এই স্থানকে এ প্রদেশের লোকে মহাতীর্থ বলিয়া জ্ঞান করে। এবং ইহাতেও স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এদেশে আর্য্য উপনিবেশ হইবার পূর্ব্বে অনার্য্য অসুরাদির বাস ছিল ও হিরণ্যাক্ষ অসুর তাহাদের অধিপতি ছিল। ধামধাহা থানার প্রায় ৫ ক্রোশ উত্তরে ধাররা নামক গ্রামে এক প্রাচীন দুর্গের ভগ্নস্তূপ দৃষ্ট হয় উহাকে সিকলিগড় কহে। দেখিলে বোধ হয় যে অতি পূর্ব্বে উহা সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। এতদঞ্চলের লোকে উহাকে দৈত্য হিরণ্যকশিপুর নির্ম্মিত বলিয়া থাকে। প্রায় ৫০০ বিঘার অধিক সমচতুষ্কোণ ভূমির চতুর্দ্দিকে ভিত্তি ও পরিখা এখনও বিদ্যমান আছে। মধ্যে প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ইষ্টক রাশি

---

* "Aryan kingdoms of Eastern India"

বিরাজ করিতেছে। ইহার পূর্ব্বদিকে ঊর্দ্ধাধোভাবে প্রোথিত একটি প্রস্তর স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। এতদঞ্চলের লোকে উহাকে মণিকাটুম কহে। এই প্রস্তর স্তম্ভের ব্যাস প্রায় ৮ হস্ত। এবং ভূমি হইতে উচ্চতা ৬ হস্তেরও কিছু অধিক হইবে। এই প্রস্তর স্তম্ভটি উঠাইবার জন্য প্রায় ১৫। ১৬ হাত খোদিত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাহার প্রান্তভাগ পরিদৃষ্ট হয় নাই। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, দেবদ্রোহী হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে এই প্রস্তরস্তম্ভে বন্ধন করিয়াছিল। যাহা হউক এতদঞ্চল যে পূর্ব্বে অনার্য্যগণের করতলস্থ ছিল ও পরে আর্য্যগণ তাহাদিগকে দুরীভূত করিয়া আপনাদের অধিকার স্থাপন করেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

মৎস্যদেশ—ঠাকুরগঞ্জ।

আর্য্য অধিকৃত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত আবার ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। মনুসংহিতায় সেই সকল রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে কোন্ রাজ্যের সীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মনুসংহিতায় মৎস্য রাজ্যের নাম উল্লেখ আছে মাত্র, কিন্তু সেই মৎস্য রাজ্য আর্য্যাবর্ত্তের কোন্ স্থানে কতদূরে ছিল তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। মহাভারত, ভাগবত, কালিকাপুরাণ, যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে মৎস্য দেশের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে একপ্রকার অনুমান করিতে পারা যায় যে, শূরসেন, পাঞ্চাল, ত্রিগর্ত্ত ও মৎস্যরাজ্য পরস্পর সংলগ্ন ছিল। * এবং এই সকল রাজ্য হিমালয়গিরি হইতে পশ্চিম দক্ষিণ বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শূরসেন, বর্ত্তমান মথুরা; পাঞ্চাল বর্ত্তমান কাণ্যকুব্জ এবং ত্রিগর্ত্ত বর্ত্তমান ত্রিহুত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মহাভারতে আরও দেখা যায় যে ত্রিগর্ত্তরাজ

---

* কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ। এষ ব্রহ্মর্ষিদেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ।

আপন সীমান্ত মৎস্যরাজ্য অনেকবার আক্রমণ করিয়াছিলেন। ত্রিহুতের পশ্চিমে কণোজরাজ্য। সুতরাং মৎস্যরাজ্য ত্রিহুতের পূর্ব্বসীমায় থাকাই সম্ভব হইতেছে। মহাভারতে উল্লিখিত কৌণ্ডিন্যরাজ্য বর্ত্তমান আসামদেশ; ইহা আসামের বুরুঞ্জী লেখকগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং মৎস্যরাজ্য ত্রিহুতরাজ্যের পূর্ব্ব হইতে কৌণ্ডিন্যদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাভারতে মৎস্যদেশ বিরাটরাজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিরাটদেশ করতোয়া হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত শত যোজন বিস্তীর্ণ সর্ব্বসিদ্ধি পুণ্যক্ষেত্র *। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ত্রিগর্ত্তের পূর্ব্বসীমা কৌশিকী নদী হইতে করতোয়া পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ মৎস্যদেশের অন্তর্গত; অর্থাৎ বর্ত্তমান পূর্ণিয়া, দিনাজপুর ও রঙ্গপুর জেলা লইয়া মৎস্যদেশ বিস্তৃত ছিল। ডাক্তার বুচানন হ্যামিলটন্ ১৮১১ খৃঃ অব্দে এদেশের যে বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে তিনি এই পূর্ণিয়া জেলাকে প্রাচীন মৎস্যদেশ বলিয়া স্থির করিয়াছেন †। অপিচ আর্য্যেরা বিনা অর্থে যে কোন শব্দ প্রয়োগ করিতেন এরূপ বোধ হয় না; পূর্ণিয়া দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলের নদী সমূহে যেরূপ অপর্য্যাপ্ত বিবিধ প্রকার মৎস্য পাওয়া যায় ভারতের আর কুত্রাপি এরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। এই মৎস্য প্রাধান্য দেখিয়াই বোধ হয় আর্য্যেরা এদেশকে মৎস্য আখ্যা দিয়া থাকিবেন।

বনভ্রমণ কালে পাণ্ডবেরা অথবা তাঁহাদের যজ্ঞের অশ্ব এ প্রদেশে আইসে নাই বলিয়া কোন কোন লোকে পূর্ণিয়া জেলাকে পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ বলিয়া অপবাদ দিয়া থাকেন। একথা সম্পূর্ণ অমূলক। পাণ্ডবেরা যে এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন তাহা পর অধ্যায়ে উল্লেখ করা যাইবে।

মহাভারতে দেখা যায় যে, বিরাট মৎস্যদেশের রাজা ছিলেন। মহাভারতের বিরাট রাজার পূর্ব্বে মৎস্যদেশের কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না।

---

* বিরাট দেশ মধ্যেতু পাদাঙ্গুলি নিপাতনং। ভৈরব অমৃতাক্ষশ্চ দেবী তত্রাম্বিকা স্মৃতা॥
করতোয়াং সমাসাদ্য যাবৎ শিখর বাসিনীং। শত যোজন বিস্তীর্ণং ত্রিকোণং সর্ব্বসিদ্ধিদং॥
৫০। চূড়ামণিতন্ত্র।

মহাভারতের সময়ে মৎস্যদেশে কিরাত, কিচক প্রভৃতি জাতির বাস ছিল দেখা যায়। বিরাট রাজার শ্যালক কিচক ঐ সম্প্রদায়ের অধিনায়ক ছিল। কিরাত, কিচক, চীন প্রভৃতিরা উপনয়নাদি জাতকর্ম্মবিরহিত থাকায় ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মনু তাহাদিগকে শূদ্রভাবাপন্ন ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন *। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, অধুনা যে সকল কিরাত, কিচক, কোচ, গণগাই প্রভৃতি জাতীয় লোক এ জেলার উত্তরাংশে দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা এক সময়ে অনার্য্য আদিম অধিবাসীদিগকে এতদঞ্চল হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়া আপনারা এদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল।

পরে মহাভারতীয় সময়ে আবার উপনয়নাদি সংস্কারসম্পন্ন ক্ষত্রিয়েরা আসিয়া ঐ কিরাত, কিচকদিগকে পরাস্ত করিয়া আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তন্মবিশেষে এই মৎস্যদেশকে বিরাট বা কিরাতদেশ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এজেলার কোচ, পলিয়ারা আপনাদিগকে রাজবংশী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। রাজবংশী শব্দার্থে রাজবংশজাত অর্থাৎ ক্ষত্রিয় সন্তান। বোধ হয় মহাভারতীয় কিচকরাজ ইহাদিগের অধিনায়ক বা রাজা ছিলেন, সেইজন্য কিচক শব্দের অপভ্রংশ কোচ বা পলায়নকারী অর্থে পলিয়া আখ্যা হইয়াছে এবং উত্তম অর্থে রাজবংশী কহে। যাহা হউক, বর্ত্তমান রাজবংশীরা মনুকথিত বৃষলত্বগত ক্ষত্রিয়বংশজাত তাহা একেবারে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তবে ইহারা প্রাচীন অনার্য্য জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে ইহাদিগকে মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত অনার্য্যজাতির মধ্যে গণ্য করেন।

কৃষ্ণগঞ্জ হইতে প্রায় ১৫ ক্রোশ উত্তরে ঠাকুরগঞ্জ। ইহা কালিয়াগঞ্জ থানা হইতে প্রায় ২ ক্রোশ। পূর্ব্বে মেচী নদী এই ঠাকুরগঞ্জের পূর্ব্ব সীমা ধৌত করিয়া দুই ক্রোশ দক্ষিণে আসিয়া কালিয়াগঞ্জের নিকট মহানন্দার সহিত মিলিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে উহা ঠাকুরগঞ্জ হইতে ৩। ৪ ক্রোশ পূর্ব্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহার পুরাতন খাদ এখনও ঠাকুরগঞ্জের নিকট বিদ্যমান আছে। লোকে

* শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥ ৪৩ ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্র দ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ। পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥

তাহাকে বুড়ী নদী কহে। ঠাকুরগঞ্জ এক্ষণে কলিকাতার ঠাকুর বাবুদিগের জমিদারি ফতেপুরসিঙ্গিয়া পরগণার অন্তর্গত। ৬।৭ বৎসর গত হইল, এখানে ঠাকুর বাবুদিগের জমিদারী কাছারি স্থাপিত হইয়াছে এবং ১৯০৩ সালে গভর্ণমেণ্ট এখানে থানা স্থাপিত করেন। কলিকাতার ঠাকুর বাবুদিগের কাছারি আছে বলিয়া যে ইহার নাম ঠাকুরগঞ্জ হইয়াছে তাহা নহে। ঠাকুর বাবুদিগের পূর্ব্বে যখন ইহা মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুরের জমিদারী ছিল তখনও ইহা এই নামে আখ্যাত হইত। এখানে বিরাট রাজার রাজধানী, দেবালয় ও উত্তরগোগৃহ ছিল বলিয়া এই ধ্বংসস্তূপকে লোকে ঠাকুরগৃহ বলিত। পরে ইহার সন্নিকটে সাপ্তাহিক হাট ও অনেক আড়তদারদিগের ব্যবসা বাণিজ্যের স্থান হওয়ায় ইহার নাম ঠাকুরগঞ্জ হইয়াছে। ইহার ২ ক্রোশ উত্তরে নেপাল রাজ্য।

জমিদার মহারাজা সার যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস, আই, বাহাদুরের সুযোগ্য নায়েব বাবু রঘুনাথ বাজপেয়ী মহাশয়ের যত্ন ও পরিশ্রমে বহুকালের জঙ্গলপরিবৃত ঠাকুরগঞ্জ এক্ষণে এ জেলার একটী প্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছে।

বাস্তবিক ঠাকুরগঞ্জের ধ্বংসস্তূপ দেখিলে বোধ হয় যে, ইহা অতি প্রাচীনকালে হিন্দুদিগেরই ছিল। এই ধ্বংশস্তূপ দেখিতে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষের মত। স্থানটী অপরাপর নিকটবর্ত্তী স্থান অপেক্ষা প্রায় ৩০ ফিট উচ্চ এবং আয়তনে ৮ বর্গ মাইলের কম হইবে না। বহুদিন গত হইল, ইংরাজ কোম্পানীর দেওয়ানীভার প্রাপ্তির পর, যখন এই জেলা প্রথম থাকবস্ত জরিপ করা হয় তখন এই কার্য্যের প্রধান কর্ম্মচারী টেলর ও রিচার্ড সাহেব এই ঠাকুরগঞ্জের ভগ্নাবশেষ খনন করাইয়া কয়েকখানি খোদিত শিলালিপি বাহির করিয়াছিলেন। ঐই সকল শিলালিপি কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। তাহার পরে জমিদারী কাছারীর নায়েব রঘুনাথ বাবু কর্ত্তৃক মৃত্তিকা গর্ভ হইতে বাহিস্কৃত প্রস্তরনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি ও প্রাসাদের ভগ্নাবশিষ্ট সুপ্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, এই স্থানে বিরাটরাজার প্রাসাদ ছিল এবং তাঁহার রাজ্য পশ্চিমে কুশী নদী হইতে পূর্ব্বে করতোয়া পর্য্যন্ত

বিস্তৃত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার হণ্টর সাহেবও এ বিষয়ে ভিন্নমত নহেন *।

কেবল ইহাই নহে। এই ঠাকুরগঞ্জের বিরাটভবনে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাত-বাসে ছিলেন। ঠাকুরগঞ্জের প্রায় ৩ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে দুইটী অনতিউচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ আছে। এখানকার লোকে উহাকে "ভীমভার" বলে। এরূপ প্রবাদ আছে যে, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে যমুনাতীরস্থ শূরসেন বন হইতে অজ্ঞাতবাসের জন্য মৎস্যদেশে বিরাটরাজধানী বর্ত্তমান ঠাকুরগঞ্জ অভিমুখে আসিবার সময় পথে এক কুম্ভকারগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কুম্ভকারপত্নীর আতিথ্য সৎকারে দ্রৌপদীর শ্রান্তিদূর হইলে উভয়ের কথোপ-কথনে দ্রৌপদী অবগত হইলেন যে, এ প্রদেশে ঘটাদি নির্ম্মাণোপযোগী মৃত্তিকার অভাব প্রযুক্ত কুম্ভকারের ব্যবসায়ের সম্যক সুবিধা নাই। এজন্য কুম্ভকার পত্নী হীনাবস্থায় দিনযাপন করেন। কুম্ভকারপত্নীর কথায় দ্রৌপদীর মন বিগলিত হইল এবং তাহার অভাবমোচনের বাসনায় ভীম-সেনকে একথা ব্যক্ত করিলেন। রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে, ভীমসেন দূরবর্ত্তী বন হইতে ঘটাদি নির্ম্মাণোপযোগী একভার মৃত্তিকা আনয়ন করিয়া কুম্ভকার গৃহের সন্নিকটে রাখিয়া দেন। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই পাণ্ডবেরা প্রচ্ছন্ন বেশে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া বিরাট ভবনোদ্দেশে যাত্রা করেন। এদিকে রজনী

---

* "At Thakurganj, in the northern part of the District (Purneah) stones with inscriptions were dug up by the Great Trigonometrical Surveyors, several years ago, when the triangulation of the District was being effected. They are said to mark the site of the chief residence of a Raja Virat, whose territory ay along the east of the Kusi, and included the country round about as far as Rangpur and Dinajpur."

Dr. W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal.
Vol. XV, P. 267.

প্রভাত হইলে কুম্ভকার দম্পতী ও তাহাদের প্রতিবেশিগণ পর্ব্বতাকার মৃত্তিকা-স্তূপ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হয়। পরে কিচকের মৃত্যুসংবাদে প্রোৎসাহিত হইয়া বিরাটরাজের চিরশত্রু ত্রিগর্ত্তরাজ যখন কৌরবদিগের সহিত মিলিত হইয়া সসৈন্যে বিরাটের উত্তরগো-গৃহ লুণ্ঠন করিতে যান এবং বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুন সারথীর সাহায্যে যখন বিরাটতনয় উত্তর কৌরবসেনার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন তখন অজ্ঞাতবাসী পাণ্ডবদিগের পরিচয় প্রকাশিত হইলে সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, এই পাণ্ডবেরাই কুম্ভকারগৃহে অতিথি হইয়াছিলেন এবং ভীম-সেনই সেই মৃত্তিকাস্তূপ আনয়ন করিয়াছিলেন। তদবধি ঐ স্থান "ভীমভার" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

ঠাকুরগঞ্জের প্রায় দেড় ক্রোশ উত্তরে মেচী নদীর অপর পারে "কিচকবধ" নামে এক স্থান আছে। ইহা নেপালরাজ্যের মোরঙ্গ জেলার অন্তর্গত শালবৃক্ষের জঙ্গলে পরিবৃত। এখানে একটী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহি-য়াছে। উহার বহিঃরক্ষণ প্রায় ২০ ফিট উচ্চ। দুর্গের সন্নিকটে বহির্ভাগে ভূগর্ভ হইতে একটী প্রস্রবণ নির্গত হইয়াছে। প্রস্রবণটী দেখিতে সাধারণ কূপের ন্যায়। ইহার ব্যাস প্রায় দুই হস্ত পরিমিত, ভূগর্ভ হইতে বালুকামিশ্রিত জল সবেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। দেখিলে ইহাকে স্বপ্রবাহক কূপ (Artesian well) বলিয়া বোধ হয়। ইহার জল অতি নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যপ্রদ। এখান-কার লোকে এই বহিরুৎসকে "পাতাল গঙ্গা" বলিয়া থাকে। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, এই স্থানে বিরাটরাজের শ্যালক কিচকের প্রাসাদ ছিল। দুর্বৃত্ত কিচক ছদ্মবেশী সৈরিন্ধ্রীর রূপে বিমোহিত হইয়া তাহার প্রতি অন্যায় আচ-রণ করিতে কৃতসংকল্প হইলে, অজ্ঞাতবাসী মধ্যম পাণ্ডব ভীম রাত্রে কিচককে এই স্থানে নিহত করেন। পরে ভূমিতে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া এই স্থানে এক বারি-উৎস উৎপাদন করেন ও স্বীয় অঙ্গাদি ধৌত করণান্তর বিরাটভবনে প্রত্যাবৃত্ত হন। তদবধি এই স্থান "কিচকবধ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই স্থানের অনতিদূরের জঙ্গলকে "উত্তরার উপবন" কহে। বিরাট তনয়া উত্তরা ঐ স্থানে বনবিহার করিতেন। ইহাও এক্ষণে শাল, হরিতকী, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতির জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। মহাভারতের লিখিত সময়ে এই

মৎস্যদেশ যে কেবল আর্য্য ক্ষত্রিয়দিগেরই আবাসভূমি হইয়াছিল এমত নহে; ইহা সংস্কারাপন্ন ব্রাহ্মণঋষিগণেরও আবাসভূমি হইয়াছিল। পুরাণে এই মৎস্যদেশের কৌশিকী বা কুশী নদী মহা পুণ্যতোয়া বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কৌশিকী পূর্ব্বে গাধিরাজের কন্যা ও রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ভগিনী ছিলেন। ইহাঁর নাম সত্যবতী। দ্বিজবর ঋচীক এই সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল পরে এই ঋচীকের পত্নী সত্যবতী ও শ্বশ্রূ পুত্রকামনা করিয়া যথাবিধি চরু পাক করিতে প্রার্থনা করিলে ঋচীক স্বীয় পত্নী সত্যবতীর নিমিত্ত ব্রহ্মমন্ত্রে এবং শ্বশ্রূর জন্য ক্ষাত্রমন্ত্রে চরু পাক করিয়া স্নানার্থে গমন করিলেন। এই সময়ে সত্যবতীর জননী মনে করিলেন, ভার্য্যার প্রতি ভর্ত্তার সমধিক স্নেহ হইয়া থাকে। জামাতা আমার কন্যার নিমিত্ত যে চরু পাক করিয়াছেন তাহা অবশ্য আমার নিমিত্ত শ্রাপিত চরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকিবে, অতএব কন্যার নিকট ঐ চরু প্রার্থনা করিলেন। সত্যবতী জননীর প্রার্থনায় ব্রহ্মমন্ত্রে শ্রাপিত স্বীয় চরু মাতাকে প্রদান করিয়া আপনি ক্ষাত্র-মন্ত্রপূত জননীর চরু ভোজন করিলেন। অনন্তর মুনি ঋচীক প্রত্যাগত হইয়া যখন ঐ বিষয় অবগত হইলেন তখন পত্নী সত্যবতীকে কহিলেন "তুমি অতিশয় গর্হিতকর্ম্ম করিয়াছ, চরু বিপর্য্যয় করাতে তোমার পুত্র ঘোর দণ্ডধর হইবে আর তোমার ভ্রাতা ব্রহ্মজ্ঞ হইবেন"। এতৎশ্রবণে সত্যবতী ভীতা হইয়া বিবিধ বিনয় করিতে লাগিলেন; তখন মুনি ঋচীক প্রসন্ন হইয়া বলিলেন "তবে তোমার পৌত্র ভয়ানক হইবে"। সত্যবতীর জমদগ্নি নামে পুত্র হইল। ঘোর দণ্ডধর পৌত্র নিরীক্ষণ করিতে না হয় এজন্য সত্যবতী মহর্ষি ঋচীকের প্রার্থনায় লোক-পাবনী পুণ্যসলিলা কৌশিকী নদী হইয়া রহিলেন *। এই সত্যবতীর পৌত্র পরশুরাম, যিনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করেন এবং ভ্রাতা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র।

এই প্রসন্নপুণ্যসলিলা কৌশিকী নদী বর্ত্তমান পূর্ণিয়া জেলার পশ্চিমসীমা বাহিনী কুশীনদী নামে অভিহিতা। ইহার তীরে মহর্ষি শমীকের আশ্রম ছিল। অভিমন্যু তনয় রাজা পরীক্ষিত মাতুলালয় মৎস্যদেশে মৃগয়া করিতে আসিয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া শমীক ঋষির আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক পানার্থ জল

* [illegible]

প্রার্থনা করিলে, ধ্যাননিমগ্ন মহর্ষি শমীক রাজা পরীক্ষিতকে সম্ভাষণ না করায় রাজা যেরূপে মৃত সর্প ঋষির গলায় দিয়া চলিয়া যান তাহা মহাভারতের আদিপর্ব্বে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। তৎপরে ঋষিপুত্র শৃঙ্গী আশ্রমে আসিয়া পিতার তাদৃশ অবস্থা দৃষ্টে ক্রোধান্বিত হইয়া কুশী নদীর জলগণ্ডূষ হস্তে লইয়া রাজা পরীক্ষিতকে অভিশাপ দেন *।

কৌশিকী নদীর জলগণ্ডূষ হস্তে লইয়া অভিশাপ দেওয়াতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শমীকের আশ্রম কুশী নদীর তীরে ছিল। আর সেই কৌশিকী যে এই বর্ত্তমান পূর্ণিয়া জেলার পশ্চিমবাহিনী কুশী নদী তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কারণ অন্য কোথাও কুশী নামে কোন নদী দৃষ্ট হয় না।

বিরাটের পর মহাভারতে এই মৎস্যদেশের আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে বিরাট ও তাঁহার পুত্রগণ নিধনপ্রাপ্ত হন। পরে কৌণ্ডিল্য † ও পৌণ্ড্ররাজ্য ‡ প্রবল হইয়া মৎস্যদেশ পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছিল।

দেখিতে পাওয়া যায় যে বিরাটের রাজধানী বর্ত্তমান ঠাকুরগঞ্জের প্রায় ১৩ ক্রোশ পশ্চিমে বেনুগড় নামে এক বিখ্যাত স্থান আছে। তথায় প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। অনেকে ইহা বানরাজার নির্ম্মিত কহিয়া থাকেন। বলিরাজার বংশধর সুপ্রসিদ্ধ বানরাজা কৌণ্ডিল্যদেশের অধীশ্বর ছিলেন। শোণিতপুর তাঁহার রাজধানী ছিল। শোণিতপুর আসাম প্রদেশের অন্তর্গত বর্ত্তমান তেজপুর। ইহার অনতিদূরে অগ্নিগড় নামে এক পর্ব্বত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ কৌণ্ডিল্যেশ্বর বানরাজার রাজধানী শোণিতপুরের অনতিদূরবর্ত্তী অগ্নিগড়ে প্রবেশ করিয়া বানরাজার কন্যা উষাকে হরণ করিয়া লইয়া

* ইত্যুক্তা রোষতাম্রাক্ষো বয়স্যানৃষিবালকঃ।
কৌশিক্যাপ উপস্পৃশ্য বাগ্বজ্রং বিসসর্জ্জহ॥
শ্রীমদ্ভাগবত। ১ম স্কন্ধ। ১৮ অধ্যায়। ৩৫ শ্লোক

† আসামের অন্তর্গত বর্ত্তমান কুণ্ডীনগর।

গৌড় প্রভৃতি পূর্ব্ব দেশ

যান *। সুতরাং বিরাট রাজবংশের লোপের পরে এদেশে কৌণ্ডিল্যরাজ গণের অধিকার-স্থাপন ও দুর্গ-নির্ম্মাণ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। অপিচ বেণুগড়ের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে যে সকল খোদিত প্রস্তরস্তম্ভ ও হস্ত পদ নাসিকাদি ছেদিত বিকৃতাঙ্গ দেবমূর্ত্তি পাওয়া যায় তাহাতে এরূপ অনুমান করা যায় যে ইহা অতি প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয় রাজগণের সম্পত্তি ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

কিরাতদেশ, বরিজান, গন্ধর্ব্বডাঙ্গা।

কালক্রমে কৌণ্ডিল্যরাজ্যের প্রাধান্য লোপ হইলে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর প্রবল হইয়া কৌণ্ডিল্যদেশ গ্রাস করে। এবং এই সুবিস্তীর্ণ মৎস্যদেশ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এ সময় এ দেশের মৎস্য আখ্যার লোপ হয়। মহানন্দার পূর্ব্ব সমগ্র ভূভাগ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অন্তর্গত হয়। পূর্ণিয়াবাসী কিরাতেরা পুনরায় প্রবল হইয়া উঠে, এবং পূর্ণিয়ার উত্তরাংশ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়। দক্ষিণভাগ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ও পশ্চিমাংশ মিথিলার অধিকারে আইসে। বাস্তবিক এ সময় এ জেলার উত্তরাংশে রীতিমত কোন রাজ্য সংস্থাপিত হয় নাই। কিরাত, কিচক প্রভৃতি শূদ্রভাবাপন্ন অসভ্য জাতিরা স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠে।

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীসরাজদূত মিগাস্থিনিস্ মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে চন্দ্রগুপ্তের সভায় ছিলেন। তিনি তদানীন্তন ভারতের এক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন ভারতের ১১৮টী খণ্ডরাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে মগধরাজ্যের পূর্ব্বভাগে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ভিন্ন অন্য কোন রাজ্যের নামোল্লেখ নাই।

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সে সময় পূর্ণিয়া জেলার উত্তর ভাগে উল্লেখ যোগ্য কোন রাজ্য ছিল না।

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম লইয়া ভারতে মহা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম মগধের রাজধর্ম্ম হইয়া উঠে। এ সময় দেখা যায় যে অনেক ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপীড়নে মগধরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পৌণ্ড্রাজ্যের অধিকারভুক্ত পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণাংশে আসিয়া বাস করেন। অধুনা পূর্ণিয়া জেলার ধামধাহা ও গোন্দবারা থানার এলাকায় ও কুশীনদীর তীরে যে মৈথিল ব্রাহ্মণগণের বাস দেখা যায়, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই সময় মগধ হইতে আসিয়াছিলেন। আর পূর্ণিয়া জেলার পশ্চিমাংশ মিথিলার অন্তর্গত থাকায় অনেক ব্রাহ্মণ এরারিয়া ও রাণীগঞ্জ থানার এলাকায় আসিয়া বাস করেন। "অশোক আবদান" নামক একখানি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই গ্রন্থখানি অশোকের গুরু উপগুপ্তের জনৈক শিষ্যের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। অশোকের রাজত্বকালের অব্যবহিত পরে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। ইহাতে দেখা যায় যে অশোকের ভ্রাতা বৌদ্ধদ্বেষী বীতশোক পাটলিপুত্র হইতে বিতাড়িত হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আশ্রয় স্থান পৌণ্ড্রাজ্যের অধিকারে আসিয়া বাস করেন।

মহাকবি কালিদাস উজ্জয়িনীর সুপ্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় থাকিয়া রঘুবংশাদি নানা সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। রাজা বিক্রমাদিত্য খৃষ্টের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। সে সময়ের প্রণীত কালিদাসের রঘুবংশে ভারতের তদানীন্তন রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া রাজা অজ পাশ্চাত্য কাম্বোজ, পারসিক, হুন প্রভৃতি জাতিকে পরাজিত করিয়া হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রাগ্জ্যোতিষপুর আক্রমণ করিতে যাইবার পথে কিরাতদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অজের জয়লাভ হইলে তত্রত্য কিন্নরেরা অজের জয়গান করিয়াছিল *

* তস্যোৎসৃষ্ট নিবাসেষু কণ্ঠরজ্জুক্ষতত্বচঃ।
গজবর্ষ্ম কিরাতেভ্যঃ শশংসুর্দেবদারবঃ॥ ৭৬।
তত্রজন্যং রঘোর্ঘোরং পার্ব্বতীয়ৈর্গণৈরভূৎ।

বর্ত্তমান ঠাকুরগঞ্জ হইতে প্রায় ৯ ক্রোশ পশ্চিমে নেপালের সীমা উপকণ্ঠে গন্ধর্ব্বডাঙ্গা নামে এক স্থান আছে। ইহা পূর্ণিয়া জেলার বাহাদুরগঞ্জ থানা হইতে ৩ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার সাধারণ লোকে ইহাকে "গর্‌বন্‌-ডাঙ্গা" কহে। এই স্থানের সান্নিধ্যে অনেক কিরাত ও কিচক জাতির বাস দেখা যায়। গন্ধর্ব্বডাঙ্গায় কিরাতদিগের গড়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিখা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে; ইহার মধ্যস্থলে শালবৃক্ষের জঙ্গল। এই স্থানের প্রায় ২ ক্রোশ উত্তরে নেপালের মোরঙ্গ অঞ্চলে অনেক দেবদারু ও ভূর্জ্জবৃক্ষ দেখা যায়। সম্ভবতঃ কবি কালিদাস এই স্থানের সন্নিকটস্থ কিরাতজাতির বিষয় আপন গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। আর স্থানের নাম গন্ধর্ব্বডাঙ্গা থাকায় বোধ হয় কবি কিন্নরের জয়গানের বিষয় লিখিয়াছেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজধানী কামরূপ পূর্ণিয়ার পূর্ব্ব সীমা হইতে পূর্ব্বদিকে অনেক দূরে। কিরাতদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধের পর কবি লৌহিত্য নদীর পর পারে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন †।

হিমালয়ের সন্নিকটে পার্ব্বতীয় কিরাতদিগের পর যখন কামরূপ রাজ্য তখন এই পূর্ণিয়া জেলার উত্তরাংশের কিরাতগণকে যে কবি কালিদাস লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কালিদাস পার্ব্বতীয় কিরাতদিগের কোন রাজা বা অধিনায়কের উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে খৃষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান পূর্ণিয়া জেলার উত্তরাংশে কিরাত প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতির প্রাধান্য ছিল। কিন্তু তাহারা রীতিমত রাজ্য স্থাপন করিতে

নারাচ ক্ষেপনীয়াশ্ম নিস্পেষোৎ পতিতানলম্‌॥ ৭৭।
শরৈরুৎসব সঙ্কেতান্‌ সকৃত্বা বিরতোৎসবান।
জয়োদাহরণং বাহ্বোর্গানয়ামাস কিন্নরান্‌॥ ৭৮।
রঘুবংশম্‌। ৪র্থ সর্গ।—

† চকম্পেতীর্ন লৌহিত্যে তস্মিন্‌ প্রাগজ্যোতিষেশ্বরঃ
তদ্গজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহকালাগুরুদ্রুমৈঃ॥ ৮১॥
ন্নমীশঃ কামরূপাণামত্যা খণ্ডল বিক্রমং।
ভেজেভিন্ন কটৈঃ নাগৈরন্যানুপরুরোধ যৈঃ॥ ৮২॥
রঘুবংশম্‌। ৪র্থ সর্গ।—

পারে নাই। এক এক দলপতি স্ব স্ব প্রধান হইয়া নানা ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করিয়াছিল। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে নেপালরাজ্য কিরাত-দিগের করতলগত ছিল। নেপালের বর্ত্তমান জীম্‌দার জাতি আপনাদিগকে কিরাত বা কিরান্তী জাতি কহিয়া থাকে। তাহারা এক সময় পাটলিপুত্র অর্থাৎ বর্ত্তমান পাটনা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া তথায় দেউল নির্ম্মাণ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগের কুর্শিনামায় লিখিত আছে। নেপালী কিরাতগণ আপনাদিগকে দুই গোত্রে বিভক্ত করে; কাশী গোত্র ও লাসা গোত্র। ভারতবর্ষীয় কিরাতগণ কাশীগোত্রীয় বলিয়া খ্যাত এবং যাহারা মধ্য এসিয়াখণ্ড হইতে আগমন করিয়াছে তাহারা লাসাগোত্রীয় হওয়াই সম্ভবপর।

বর্ত্তমান পূর্ণিয়া জেলার উত্তরাংশে স্থানে স্থানে যে অনেক প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল এই কিরাতদলপতিদিগের নির্ম্মিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। এ প্রদেশে এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে বরিজানগড়, নান্‌না ও কান্‌নাগড় এবং অসুরাগড় খৃষ্টের ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কোন অসুররাজ কর্ত্তৃক এক রাত্র মধ্যে নির্ম্মিত হয়। অসুররাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া এ প্রদেশের কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই এই সকল গড়ের ধ্বংসাবশেষ পবিত্র জ্ঞানে তথায় গমন করিতে সাহসী হয় না।

বরিজান গড়—বরিজান গড় কৃষ্ণগঞ্জ হইতে প্রায় ৬।৭ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম শ্রীপুর পরগণার অন্তর্গত। এখানে পাঁচটি অনতিউচ্চ জঙ্গল পরিবৃত ধ্বংসস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাঁচটী স্তূপের মধ্যে প্রায় ৪।৫ বিঘা পতিত ভূমি আছে; অনুমান হয় যে উহা গড়ের মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গণ ভূমি ছিল। স্থানে স্থানে হস্ত, পদ, নাসিকাদি ছিন্ন প্রস্তরময় দেবমূর্ত্তি পতিত বা অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় আছে দেখা যায়। এই সকল ধ্বংসস্তূপের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে, ইহাকে লোকে "ডাকপুকুর" কহে। বরিজান গড় ও ডাকপুখুর সম্বন্ধে এখানকার লোকের মুখে অনেক অদ্ভুত গল্প শুনা যায়। এখানে তাহার দু একটীর উল্লেখ করা গেল। (১) রাত্রে নিকটস্থ গ্রামবাসীরা টাকা, মোহর প্রভৃতি নাড়াচাড়ার শব্দ শুনিতে পাইত। পরে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া ঐ

াংশ খনন করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলন করিলে ঐ স্তূপ হইতে অনেক মোহর বাহির হয়। পরে প্রাতে সকলে দেখে যে সন্ন্যাসী ক্ষিপ্ত হইয়া অসংলগ্ন কথা বার্ত্তা কহিতেছে ও ক্রমাগত উচ্চহাস্য করিতেছে। এই সন্ন্যাসীর পর আর কোন লোক ঐ স্থানে যাইতেও সাহসী হয় নাই। (২) কাহার বাটীতে কোন উৎসব উপলক্ষে তৈজসাদির প্রয়োজন হইলে এই ডাক পুকুরের নিকট গিয়া পূর্ব্বদিনে তৈজসাদি যাচ্ঞা করিলে রাত্রে পিত্তল কাংস্য ও রৌপ্যময় তৈজসাদি ঐ পুষ্করিণীর তীরে উঠিয়া থাকিত। প্রার্থী প্রাতে যাইয়া উহা লইয়া আসিত; এবং ব্যবহারান্তে আবার ঐ ডাকপুকুরের জলে ঐ সমস্ত তৈজসাদি রাখিয়া আসিতে হইত। এইরূপে তৈজসাদি লইয়া লোভবশতঃ এক ব্যক্তি ব্যবহারান্তে ফিরাইয়া না দিয়া আত্মসাৎ করে, ঐ সময় হইতে তৈজসাদি প্রাপ্তি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। (৩) এই ডাকপুকুরের মৃত্তিকা লইয়া অন্য জলাশয়ে নিক্ষেপ করিলে সে জলাশয়ের সমস্ত মৎস্য আসিয়া এই নিক্ষিপ্ত মৃত্তিকার নিকট জমা হইত।

অসুরাগড়—অসুরাগড় কৃষ্ণগঞ্জ হইতে ৯ ক্রোশ দক্ষিণে মহানন্দার পূর্ব্বপারে অল্পদূরে অবস্থিত। অসুরদেবের নির্ম্মিত বলিয়া ইহাকে "অসুরাগড়" কহে। ইহার প্রকৃত নাম কিচকগড়। দেবনির্ম্মিত বোধে এখানকার লোকে ইহার নিকট গমন করিত না। পরে এক মুসলমান ফকির আসিয়া এখানে কয়েকদিন অবস্থিতি করিল দেখিয়া সাহসী হইয়া এক্ষণে মুসলমান কৃষকেরা ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিতে চাষ আরম্ভ করিয়াছে। হিন্দুরা এখনও প্রতি বৎসর এখানে আসিয়া অসুরদেবের পূজা দিয়া থাকে। কিচক জাতীয়েরা এখানে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সমাগত হয়। এই দুর্গ কিচক অধিপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া ইহাকে লোকে কিচকগড় কহে। অসুরাগড়টী দেখিলে বাস্তবিক একটী দুর্গের বহিরক্ষণ স্থান (rampart) বলিয়া বোধ হয়। অনুমান হয় ইহা পূর্ব্বে মহানন্দার পারে নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরে মহানন্দা ঐস্থান হইতে প্রায় এক ক্রোশ পশ্চিমে সরিয়া গিয়া থাকিবে। এই গড় চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি অপেক্ষা প্রায় ১৪ ফিট উচ্চ এবং ইহার পরিধি প্রায় সার্দ্ধ মাইলেরও অধিক হইবে। এখনও এই স্থান খনন করিলে স্থানে স্থানে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত গৃহাদি দেখা যায়।

নানন্‌ কাননগড়—নান্‌না কান্‌না গড়ের ধ্বংশস্তূপ অদ্যাবধি নান্‌না কান্‌না নামক স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ স্থানটী কৃষ্ণগঞ্জ হইতে দশ ক্রোশ এবং কৃষ্ণগঞ্জের অধীন খানাবাড়ী গ্রাম হইতে ৩ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। দুইস্থানে দুইটী সুবৃহৎ ইষ্টকস্তূপ ব্যতীত দুর্গের অন্য কোন প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই স্থানে কানাইয়াজী নামে একটী দ্বিভুজ কৃষ্ণমূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। তৎসন্নিকটবর্ত্তী হিন্দুগণ প্রতি বৎসর মাঘমাসে রবিবারে কানাইয়াজির পুজা করিয়া থাকেন। তথায় আরও কএকটী প্রস্তরময় হিন্দু দেবমূর্ত্তি সংগ্রহ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী বামন মূর্ত্তি বাবু প্রীতিচাঁদ লালের ম্যানেজার বাবু মদনমোহন দাস কর্ত্তৃক পোয়াখালি কাছারীতে রক্ষিত হইয়াছে। গড়ুর মূর্ত্তি, খানাবাড়ীর স্বনাম খ্যাত জমিদার ৺মধুসূদন সিংহ বাহাদুরের পরলোকগতা সূর্য্যমনী চৌধুরাণীর দেবালয়ের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। খানাবাড়ীর বিখ্যাত জমিদার বাবু শেখলাল সিংহ ও বাবু ভবানন্দ সিংহ মহাশয়দিগের বাটীতে একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং বিশ মনেরও অধিক ওজনের একখানি বৃহদাকার প্রস্তরময় খিলান (arch) রক্ষিত হইয়াছে। নান্‌না কান্‌না গড়ের এক মাইল উত্তর পূর্ব্বে কএকটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। তন্মধ্যে "জোড়দিঘী" নামক পুষ্করিণীদ্বয় বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহার নিম্নভাগের পরিমাণ ১৬ বিঘা এবং ইহার চতুষ্পার্শ্ব ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত।

পঞ্চম অধ্যায়।

—:*:—

বৌদ্ধপ্রাধান্য।—বরেন্দ্র ও মিথিলা বিভাগ।

পূর্ণিয়া জেলার উত্তরভাগ কিরাত ও কিচকদিগের হস্তে এবং দক্ষিণ-ভাগ পৌণ্ড্র রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে*। এ সময় পূর্ণিয়া

* সিকিমদিগের হস্তলিখিত ইতিহাসে লিখিত আছে যে কারগোলা পর্য্যন্ত গঙ্গার উত্তর সমগ্রভূভাগ তাহারা দখল করিয়াছিল। বস্তুত এই প্রদেশ কখন নেপালীগণ কখন বা সিকিম অধীবাসিগণ করায়ত্ব করিয়াছিল

জেলার দক্ষিণভাগ পূর্ব্বের ন্যায় জলমগ্ন ছিল না, কৃষি উপযোগী ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। তবে উল্লেখযোগ্য কোন গ্রাম বা নগর সংস্থাপিত হয় নাই। অনুমান হয় কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া পূর্ণিয়া জেলা এই অবস্থায় ছিল।

পরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রাধান্য হ্রাস হইলে তাহার স্থানে গৌড়াধিপতি পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙ্গালায় আপন প্রাধান্য বিস্তার করেন। মগধের উচ্ছেদের পর বঙ্গের পালবংশীয় বৌদ্ধনৃপতিরা, খৃষ্টাব্দের দশম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম, পূর্ণিয়া, জলপাইগুড়ি, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইলে সঙ্গে সঙ্গে আচার ব্যবহার রীতিনীতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া দেশ মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক চিহ্ন অদ্যাপি এতদঞ্চলে বিদ্যমান আছে। আসাম ও পূর্ণিয়া বা জলপাইগুড়ি জেলার স্থানে স্থানে বিকলাঙ্গ অনেক বৌদ্ধদেবমূর্ত্তি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠিত "হয়গ্রীবমাধব" নামে এক দেবালয় অদ্যাপি জলপাইগুড়ি জেলায় বিদ্যমান আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের উপপ্লবে এমন কি কামাখ্যাদেবীর মন্দির ও জঙ্গলে পরিবৃত হইয়াছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত হইবার অনেক পরে তাহা পুনরাবিষ্কৃত হয়। এই বৌদ্ধপ্রাধান্যের সময় পূর্ণিয়া জেলার উত্তরাংশ পাল রাজাদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল এবং আসামের কমতাপুরের রাজাবংশীয়েরা জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরের উত্তরাংশ হস্তগত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধপ্রাধান্যের সময় নেপাল রাজ্যে নেওয়ার, মঙ্গর, গুরঙ্গ প্রভৃতি যে সকল জাতি বাস করিত তাহারা এবং নেপাল রাজ্যের রাজাও বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। ভুটিয়া ও তিব্বতীয়গণ বৌদ্ধমত শিক্ষা করে। তাহাদের রাজ্য পূর্ণিয়ার উত্তর পূর্ব্ব অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল *। খৃষ্টের দশম শতাব্দীর শেষভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম এতদ্দেশ হইতে তিরোহিত হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম এ প্রদেশ হইতে তিরোহিত হইবার একটী উপাখ্যান যোগিনী-তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। একদা এক ব্রাহ্মণের যুবতী কন্যা ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে যান। যুবতীর রূপে ও ভক্তিতে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রীত হইয়া যুবতীর প্রতি

* দুর্গাচরণ রক্ষিতের বাঙ্গালী বৈশ্য ৬ পৃষ্ঠা হইতে ১০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

আসক্ত হয়। ব্রহ্মপুত্রের ঔরসে এই যুবতীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কামরূপের সিংহাসন অধিকার করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত করিয়া পুনরায় এতদঞ্চলে শক্তি পূজার প্রচলন করেন। ইঁহার বংশধরেরা কামরূপে অনেককাল রাজত্ব করেন এবং ইঁহারাই আসামের ইতিহাসে ব্রহ্মপুত্র-বংশীয় বলিয়া বিখ্যাত। আসামের ইতিহাস লেখক রবিনসন্ সাহেব এই যোগিনীতন্ত্রের উল্লেখ করিয়া বলেন যে "করতোয়া নদীর তীরে জন্ম নাগশঙ্কর নামে এক ব্রাহ্মণ কুমার কামরূপের রাজা হইয়া এতদ্দেশে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রচলন করিয়াছিলেন।" যাহা হউক যোগিনী তন্ত্রের উপাখ্যান ভাগ ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় যে কোন অজ্ঞাত কুলশীল জারজ ব্রাহ্মণ সন্তান কামরূপের রাজা হন এবং তাঁহার উদ্যোগে বৌদ্ধধর্ম্ম এতদ্দেশ হইতে তিরোহিত হয়।

অনেকে বলেন এ প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম স্রোতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইলে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে তান্ত্রিক পরিব্রাজকেরা আসিয়া শক্তিপূজার প্রচলন করেন। যাহা হউক হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকগণের পরিশ্রম ও যত্নে যে বৌদ্ধধর্ম্ম এতদঞ্চল হইতে তিরোহিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সংশয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্ম এতদঞ্চল হইতে তিরোহিত হইলেও পূর্ণিয়া জেলার নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দু অধিবাসিগণের আচার ব্যবহার ও ভাষায় অদ্যাপিও তাহার প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মে জাতি বিচার নাই, এ জন্য বৌদ্ধপ্রাধান্যের সময় অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়ায় অনেক সঙ্করবর্ণের উদ্ভব হইয়াছিল। বিধবা বিবাহ অদ্যাপিও এ জেলার নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। স্বামীর মৃত্যু হইলে সেই বিধবাভ্রাতৃবধূর দেবরের সহিত বিবাহ হয়। বিবাহপদ্ধতিরও নানাপ্রকার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ বিষয় পরে যথাস্থানে লিখিত হইবে। বৌদ্ধ প্রাধান্যের সময় নেপাল, ভোট, আসাম, বর্ম্মা, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশের লোকের এ জেলায় সর্ব্বদা গতিবিধি থাকায় এ দেশের ভাষাও নানাদেশের মিশ্রণ শব্দে এক প্রকার কিম্ভুত কিমাকার হইয়াছে। বিহারের কায়েতী শব্দে বাঙ্গালা ও আসামীয় শব্দ মিশ্রিত হইয়া এ দেশের সাধারণ লোকের ভাষা

ইহার সহিত গৌড়েশ্বর ধর্ম্মনারায়ণ নৃপতির বিবাদ উপস্থিত হয় এবং মহানন্দার তীরে ইঁহাদিগের পরস্পরে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। বহুদিন যুদ্ধের পর দুইজনেএকদা রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া পর দিন পরস্পর সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধিতে মহানন্দার পূর্ব্বপারস্থ তাবৎ ভূভাগ হইতে কমতাপুরেশ্বর বঞ্চিত হয়েন। এবং ভবিষ্যতে আর বিবাদ না হয় এজন্য গৌড় হইতে সাত জন ব্রাহ্মণ ও সাত জন শূদ্র কমতাপুরে দূতস্বরূপ প্রেরিত হয়।*

এই গৌড়েশ্বর ধর্ম্মনারায়ণ কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন জানা যায় না। আসামের ইতিহাসেও এই দুর্ল্লভনারায়ণ ও ধর্ম্মনারায়ণের মহানন্দার পারে যুদ্ধের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তাহাতেও দুর্ল্লভনারায়ণের রাজত্বকাল নির্ণয়ের কোন কথা উল্লিখিত হয় নাই। যাহা হউক ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বর্ত্তমান পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ মহানন্দার পূর্ব্ব তাবৎ ভূভাগ এককালে কমতাপুরের রাজাদের অধিকারে ছিল পরে গৌড়েশ্বর তাহা করতলস্থ করেন।

দানসাগর নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা বল্লালসেনের সময় রচিত হয়। উহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাজ কার্য্যের সুবিধার জন্য সমগ্র গৌড় রাজ্য পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল—

১। রাঢ়—ভাগীরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ।

২। বাগড়ি—পদ্মার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পূর্ব্ব।

৩। বরেন্দ্র—পদ্মার উত্তর এবং করতোয়ার পশ্চিম ও মহানন্দার পূর্ব্ব।

৪। বঙ্গ—করতোয়া ও পদ্মার পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ প্রদেশ।

৫। মিথিলা—মহানন্দার পশ্চিম।

---

* কমতাপুরত দুর্লভনারায়ণ নামে একনা রজা আছিল। মহানন্দা বা মহানদীর সিপারে ধর্ম্মনারায়ণ নামে গৌড়দেশর রজার সইতে দেশ লোবার নিমিত্তে তেওর ঘোর যুদ্ধ হইছিল। কেইবা দিনো যুদ্ধ হই অনেক লোক নষ্ট হল। পাছে দুইও জনে এদিনা রাতি স্বপ্ন দেখি তার পাছদিনা দুইও সখি করি সন্ধি করিলে। আরু মহানন্দার সিপার দেশক কমতেশ্বর ছাড়ি দিলে। আরু গৌড়েশ্বরে দেশর বয় বার্ত্তা লই থাকিবলৈ সাত ঘর ব্রাহ্মণ আরু সাত ঘর শুদ্র দিলে।...গুরুজনর কথা চরিত পথী।

ইহাতে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান বগুড়া, রঙ্গপুর, মালদহ, দিনাজপুর এবং পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ বলরামপুর ও কৃষ্ণগঞ্জ থানা গৌড় রাজ্যের বরেন্দ্র বিভাগের আর মহানন্দার পশ্চিম অর্থাৎ পূর্ণিয়ার সদরের অন্তর্গত তাবৎ ভূভাগ গৌড়ের মিথিলা বিভাগের মধ্যে পড়িতেছে। কিন্তু উত্তরে পূর্ণিয়া জেলার কতদূর পর্য্যন্ত মিথিলা বিভাগের সীমা নির্দ্ধারিত ছিল জানা যায় না। যাহা হউক বর্ত্তমান পূর্ণিয়া জেলার উত্তর পশ্চিমের কিয়দংশ অর্থাৎ থানা বাহাদুরগঞ্জ ও এরেরিয়া ব্যতীত সমগ্র ভূভাগই এই একাদশ শতাব্দী হইতে গৌড়ের অধীনে ছিল বলিতে পারা যায়। কিন্তু এসময় বর্ত্তমান পূর্ণিয়া সহরের সংস্থাপন হইয়াছিল কিনা ঠিক বলা যায় না। এ সময় পূর্ণিয়া সহর বলিয়া খ্যাত থাকিলে অবশ্য দান সাগর গ্রন্থে মিথিলা বিভাগ স্থলে পূর্ণিয়া নাম দেখিতে পাওয়া যাইত। তবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে এই দ্বাদশ শতাব্দীতে এ প্রদেশের বিরাট রাজ্য অথবা কিরাত বা কিচক রাজ্য এরূপ আখ্যা লোপ পাইয়াছিল। ইহাকে এ সময় বরেন্দ্র ও মিথিলা বিভাগ বলা হইত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

:():

মুসলমান অধিকার।

দ্বিতীয় লক্ষণসেন গৌড়ের সেন বংশের শেষ রাজা। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিৎ লেখকেরা ইঁহাকে লাক্ষ্মণ্যসেনও বলিয়া থাকেন। ইনি ১২০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই লক্ষ্মণ সেনের সময় পূর্ণিয়া সহর সংস্থাপিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই পূর্ণিয়া সহর ও তৎচতুষ্পার্শ্বস্থ রাজ্য বহিঃশত্রুর আক্রমন হইতে রক্ষা করিবার জন্য লক্ষণ সেন রাজ্যের পশ্চিম সীমায় একটী সুপ্রশস্ত বাঁধ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইহাকে বীর বাঁধ কহে। বর্ত্তমান পূর্ণিয়া জেলার পশ্চিমস্থ কুশী নদীর পশ্চিম পারে বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলার মধ্যে স্থানে স্থানে এই বীর বাঁধ

অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কথিত আছে, এই বীর বাঁধ নির্ম্মাণের পর হইতে গৌড়েশ্বর, নির্ব্বিবাদে বর্ত্তমান পূর্ণিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সম্পূর্ণরূপে আপন অধিকারে রাখিতে পারিয়াছিলেন। কালিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্গত বর্ত্তমান রামগঞ্জের এক ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে এক সুবৃহৎ নির্ম্মল বারিপূর্ণ দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়, উহাকে এতদঞ্চলে "লক্ষ্মণহার" বলিয়া থাকে। এরূপ প্রবাদ আছে যে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন এতদঞ্চল আপন অধিকার ভুক্ত করিয়া এই দীর্ঘিকা খনন করান, তদবধি উহা "লক্ষ্মণহার" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এ প্রদেশে এই দীর্ঘিকা সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। এই সময় হইতে বোধ হয় পূর্ণিয়া আখ্যা হইয়া থাকিবে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এই দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পূর্ণিয়া বর্ত্তমান সময়ের মত সহর ছিলনা।

ভারতবর্ষ মুসলমানের অধিকৃত হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বা তৎসমকালে ব্রাহ্মণগণ ও রাজপুতগণ নেপালে প্রবিষ্ট হইয়া মগর গুরঙ্গ ও নেওয়ার নাম ধেয় তত্রত্য অনার্য্য পার্ব্বত্য জাতিদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন এবং আর্য্য ক্ষত্রিয়েরা তথাকার রাজা হইয়া নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন। এবম্বিধ বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বংশের সংমিশ্রণে এক অভিনব ভাবের উদয় হইলে তদ্বারা তাঁহাদের ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া তিব্বতীয় ও ভারতীয় বাক্যের মিশ্রণে খসকুরা নাম ধেয় পৃথক্ উপভাষায় পরিণত হয়।

এই দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনের সময় ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গদেশ অধিকার করেন। এই রাজ্য পরিবর্ত্তনের সময় সুযোগ পাইয়া আর্য্য নেপালিগণ বর্ত্তমান পূর্ণিয়া সহরের উত্তর পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগ আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন।

নেপালিরা সময়ে সময়ে মুসলমান অধিকৃত গ্রাম ও নগরে যাইয়া প্রজাদিগের শস্যাদি লুণ্ঠন প্রভৃতি নানা প্রকার উপদ্রব করিত। গৌড়ের মুসলমান শাসন-কর্ত্তারাও উত্তরাংশ হইতে নেপালীদের দূরীভূত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু সফল হইতে পারেন নাই। নেপালীদের উপদ্রব নিবারনার্থ

শেষ ভাগে পূর্ণিয়া সহরের প্রায় ৫।৬ ক্রোশ উত্তরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই সময় জেলালউদ্দিন খিলিজী দিল্লীর সম্রাট ছিলেন এজন্য তাঁহার নামানুসারে এই দুর্গকে জেলালগড় কহে। পূর্ণিয়ার প্রধান জমিদার মিঃ আর্ থার্ ফরবস্ সাহেবের জমিদারী মধ্যে ইহা অদ্যাপি ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান আছে।

১৩২৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহন করিয়া চীন সাম্রাজ্য জয়াভিলাষে এতদঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করেন। তাঁহার নিষ্ফল চীন আক্রমণ এবং অন্যান্য প্রদেশীয় সমরে রাজ কোষ শূন্য হইলে বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তার উপর রাজস্ব প্রেরণের জন্য কঠিন আদেশ প্রদান করেন। কথিত আছে পূর্ণিয়া হইতে গৌড়ে রাজস্ব প্রেরিত হইলে পথিমধ্যে তাহা দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। এই দস্যুগণকে ধৃত করিতে না পারায় বাদসাহ এই পূর্ণিয়া জেলার বিস্তৃত প্রান্তর ও জঙ্গলে গ্রাম সংস্থাপন করাইবার জন্য, এই আদেশ প্রচার করেন যে, যে সকল দণ্ডিত অপরাধী পূর্ণিয়া জেলায় গিয়া বাস করিবে তাহাদের দণ্ড ও অপরাধ বাদসাহ ক্ষমা করিবেন। এই সময় হইতে এ জেলায় মুসলমানের বাস আরম্ভ হয়। এইরূপে নবাবগঞ্জ, কুতবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের উদ্ভব হয়; ইহা তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

গৌড়ের নবাব সেরসাহের সময় অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ণিয়ার মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা ও রাজস্বের পরিমাণ সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কথিত আছে হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধে সেরসাহের অধিকাংশ লস্কর পূর্ণিয়া হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের নবাব সোলেমান কাররাণীর সেনাপতি হিন্দুধর্ম্মোদ্বেষী কালাপাহাড় এ প্রদেশে আগমন করেন। কালাপাহাড়কে এতদঞ্চলে সাধারণ লোকে কালাসুঠান বা কালাযবন বলিয়া থাকে। কালাপাহাড়ের জয়াভিলাষ যত থাকুক আর নাই থাকুক হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এ জেলার ভগ্নদেবালয় ও প্রাচীন দুর্গের ভগ্নস্তূপের মধ্যে প্রোথিত যে সকল বিকলাঙ্গ দেবদেবীমূর্ত্তি পাওয়া যায় সে সকল সেই কালাপাহাড়ের অত্যাচারের পরিচায়ক। এ সময় পূর্ণিয়া জেলার অনেক নিম্ন ও উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুকে বল পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয় এবং মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি

পাইতে থাকে। সোলেমানের রাজত্ব সময়ের অব্যবহিত পরে গৌড় নগরে এক ভীষণ মহামারী উপস্থিত হয়। গৌড়ের অধিবাসীগণ অনেকে নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন পরায়ণ হয়েন। এ সময় গৌড়দেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈশ্য প্রভৃতি উচ্চবংশীয় হিন্দু পুর্ণিয়া জেলায় আসিয়া বাস করায় পুনরায় অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গৌড় হইতে ভাগীরথীর পশ্চিম পারে রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। আকবরের নামানুসারে রাজমহলকে আকবরনগর বলা হইত। সমৃদ্ধিশালী [illegible]াচীন গৌড়নগর বিজন জঙ্গলে পরিণত হয়।

গৌড়নগর ধ্বংশ হইবার পর ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর পুনরায় বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে দিল্লীর অধীনে আনয়ন করেন এবং ভবিষ্যতে বিদ্রোহ না হয় এরূপে রাজ্য শাসনের সুবন্দোবস্ত করেন। এস্থলে সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক।

আকবর সমগ্র রাজত্ব ভিন্ন ভিন্ন সুবায় বিভক্ত করেন। এবং প্রত্যেক সুবায় নবাবী উপাধী দিয়া এক এক জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইঁহাদিগকে সুবাদার বলা হইত; সুবাদারের হস্তে রাজস্ব আদায় বিষয়ের কার্য্য সৌকার্য্যার্থে প্রত্যেক সুবাদারের এক জন করিয়া দেওয়ান থাকিত। এবং সৈন্য এবং পুলিস বিভাগের কার্য্য তত্ত্বাবধারণের জন্য এক জন করিয়া কোতয়াল থাকিত। প্রত্যেক সুবাকে ভিন্ন ভিন্ন সরকার বা জেলায় বিভক্ত করা হইল। এবং প্রত্যেক জেলা আবার নানা মহল বা পরগণায় বিভক্ত করা হইল। সুবাদারের অধীনে প্রত্যেক জেলায় এক এক জন করিয়া ফৌজদার থাকিত। ফৌজদারের অধীনে সৈন্য থাকিত। প্রত্যেক পরগণায় এক এক জন কাননগু রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত থাকিত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এই আকবর বাদসাহের রাজস্ব সচিব আবুল ফজল আইনী আকবরী গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, তাহাতে দেখা যায় যে এই পুর্ণিয়া জেলা সুবে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার অন্তর্গত। সুবাদারের রাজধানী ঢাকা নগরীতে ছিল। পুর্ণিয়া জেলা ২৮টী পরগণায় বিভক্ত ছিল।

আকবর বাদসাহের নূতন বন্দোবস্তের সময় কে পূর্ণিয়ার ফৌজদার ছিলেন জানা যায় না। বাদসাহ সাহাজাহানের সময় অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন সাহাজাদা সুজা বাঙ্গলার সুবেদার ছিলেন, তখন তাঁহার অধীনে পূর্ণিয়ার ফৌজদারের মধ্যে অস্তওয়াল খাঁ নামে এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। ইঁহার উপাধী নবাব ছিল। বর্ত্তমান পূর্ণিয়া সহরের অনতিদূরে বাগমারা নামক স্থানে ইঁহার প্রাসাদ ছিল। এই সময় হইতে পূর্ণিয়ার নিশ্চিত ইতিহাস আরম্ভ হয়। নবাব অস্তওয়াল খাঁর সময় পূর্ণিয়ার সীমা উত্তরে জেলালগড় ও পূর্ব্বে কনকাই নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জেলার উত্তর ও পূর্ব্বভাগ নেপালরাজের অধিকারে ছিল। কৃষ্ণগঞ্জের উত্তরে কুতবগড়ে নেপালরাজের সৈন্য সামন্ত থাকিত। নবাব অস্তওয়াল খাঁ সইদ রেজা নামে জনৈক উমরাওকে সুরজাপুরের কাননগু করিয়া পাঠান। সুরজাপুর কৃষ্ণগঞ্জের ৬ ক্রোশ দক্ষিণে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কুতবগড়ের নেপালিরা রাজস্ব আদায়ের বড় বিঘ্ন জন্মাইত এবং মুসলমান অধিকারে আসিয়া সর্ব্বদা উৎপাৎ করিত; ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে সইয়দ রেজা নেপালীদিগকে কুতবগড় হইতে দূরীভূত করেন। এবং মুরমালা নামক স্থানে তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া মহানন্দার পূর্ব্বকুলস্থ এ জেলার তাবৎ ভূভাগ সুরজাপুরের অন্তর্ভুক্ত করেন।

অস্তওয়াল খাঁর পরে আবদুল্লা খাঁ পূর্ণিয়ায় ফৌজদার পদে নিযুক্ত হয়েন। আবদুল্লা খাঁর মৃত্যু হইলে ১৬৮০ খৃঃ নবাব ইস্‌ফানদিয়ার খাঁ ফৌজদারের পদে অভিষিক্ত হন। পূর্ণিয়ার প্রাচীন কাগজ পত্রে দেখা যায় যে বাদসাহ আলমগীরের ৩৫ বৎসর রাজত্ব সময়ে অর্থাৎ ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে ইস্‌ফানদিয়ার খাঁ পূর্ণিয়ার নবাব ছিলেন। ১৬৯৪ হইতে ১৭২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইস্‌ফানদিয়ারের পুত্র বাবনিয়ার খাঁ পূর্ণিয়া শাসন করেন।

সপ্তম অধ্যায়।

পূর্ণিয়া সদর।

বাসনিয়ার খাঁর পরে সইফখাঁ পূর্ণিয়ার নবাব হয়েন। ইনি পূর্ণিয়ার ফৌজদারগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে সইফখাঁ মুঙ্গের সরকারের অন্তর্গত ধরমপুর পরগণার রাজা বীরসাকে যুদ্ধে পরাভূতকরিয়া ধরমপুর পরগণা পূর্ণিয়ার অন্তর্ভূত করেন*। তৎপরে নেপালীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া মহানন্দার পশ্চিম তাবৎ ভূভাগ অধিকার করেন। সইফ খাঁ সমগ্র পূর্ণিয়া জেলাকে প্রধানতঃ তিন খণ্ডে বিভক্ত করেন। পূর্ব্ব খণ্ড—মহানন্দার পূর্ব্বপার অর্থাৎ বর্ত্তমান সুরজাপুর পরগণা। উত্তরখণ্ড—মহানন্দার পশ্চিম ফতেপুর সিঙ্গিয়া ও শ্রীপুর পরগণার উত্তর অর্থাৎ বর্ত্তমান পোয়াখালী পরগণা। তৃতীয় খণ্ড—পোয়াখালীর দক্ষিণ ও মহানন্দার পশ্চিম। শেষোক্ত বিভাগ সদরের অধীন রাখিয়া, অপর দুই খণ্ড শাসন জন্য আপন অধীনে কাননগু নিযুক্ত করেন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে গরিব সিংহ নামক এক ব্যক্তি বাঙ্গালী বৈশ্যকে ফতেপুর পরগণার ও সইদ মুরমহম্মদকে সুরজাপুরের কাননগু নিযুক্ত করিয়া সনন্দ দেন। এইরূপে সইফ খাঁ সমগ্র পূর্ণিয়া জেলা আপন অধিকারে আনিয়া ছিলেন। ইহাঁর সময় পূর্ণিয়ার রাজস্ব অনেক গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সইফ খাঁ আপন রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেও মুর্শিদাবাদে দেয় কর বৃদ্ধি করেন নাই। সইফ খাঁ বাদমারা হইতে আপন রাজধানী বর্ত্তমান পূর্ণিয়া সহরে সংস্থাপিত করেন। পূর্ণিয়া সহরের সন্নিকটে রামবাগ, বেগমদেউড়ী, লালবাগ ও খুস্কিবাগ অদ্যাবধি সইফ খাঁর পরিচয় দিতেছে। আপন রাজধানী সুদৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ণিয়া সহরের প্রায় ১০ ক্রোশ

---

* See Mr. Grants Analysis of the Revenue of Bengal.

দক্ষিণে সইফ খাঁ এক নগর সংস্থাপন করেন। তাহার নামানুসারে ইহাকে সইফগঞ্জ কহা যায়। ইহার অন্য নাম কাটীহার। (সইফ খাঁর বংশ মর্য্যাদাও এত উচ্চ ছিল যে মুরশিদাবাদের নবাব সুবেদার মুর্শিদকুলির পৌত্রী নফিসা বেগমকে পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।) (প্রমাণ নাই)

সইফ খাঁর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ফকরুদ্দিন হোসেন খাঁ পুর্ণিয়ার নবাব ফৌজদার হয়েন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবর্দ্দি খাঁ পুর্ণিয়ার সরকারের অত্যধিক রাজস্ব আদায় দেখিয়া এখানকার ফৌজদারের পদে অপর লোক রাখা নিরাপদ বিবেচনা না করিয়া ফকরুদ্দিন খাঁকে বিতাড়িত করিয়া আপন জামাতা সৌলত জঙ্গকে পূর্ণিয়ার ফৌজদার নিযুক্ত করেন। এই সৌলত জঙ্গের আর একটী নাম সইদ আহাম্মদ। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সৌলতজঙ্গের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র, আলিবর্দ্দির দৌহিত্র সকতজঙ্গ পূর্ণিয়ার নবাব হন।

এই সময় আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার অপর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। আলিবর্দ্দির পুত্র সন্তান ছিল না। এই দুই জন দৌহিত্র তাঁহার উত্তরাধিকারী। ভবিষ্যতে বঙ্গের সিংহাসন লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ না হয় একন্য তিনি সকতজঙ্গকে পূর্ণিয়াসরকার চিরস্থায়ী জাইগীর করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সিরাজ ও সকতজঙ্গ দুজনেই বঙ্গের সিংহাসন লইয়া বিবাদ আরম্ভ করেন। সাইরউল মুতাক্ষরীন নামক ফার্সি গ্রন্থে এই উভয়ের বিবাদ ও যুদ্ধ বিশদরূপে বর্ণিত আছে।

মাতামহের মৃত্যুর পর সিরাজ নির্ব্বিবাদে সিংহাসনে আরোহন করেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই আপন দেওয়ান মিরজাফর সিরাজকে বাঙ্গালার সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে সকতজঙ্গকে উত্তেজিত করেন, এবং সেই কারণে মিরজাফর সিরাজ কর্ত্তৃক অপমানিত ও মুর্শিদাবাদ হইতে তাড়িত হইয়া পূর্ণিয়ার সকতজঙ্গের নিকট আসেন। উদ্ধত সিরাজ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া দিল্লীর বাদশাহের নিকট সনন্দ লয়েন নাই। মিরজাফরের পরামর্শে সকতজঙ্গ দিল্লীর বাদসাহ দ্বিতীয় আলমগিরের নিকট হইতে সনন্দ

মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিবার জন্য আজ্ঞা প্রেরণ করেন, ইহা জানিতে পারিয়া সিরাজ সসৈন্যে পূর্ণিয়া আক্রমণ করিবার জন্য বহির্গত হন। কিন্তু রাজমহল পর্য্যন্ত আসিয়াই কলিকাতা প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। তদ্‌পরে রাজা জানকি রায়ের পুত্র রাসবিহারী নামে তদীয় জনেক অমাত্যকে বীরনগর ও গোঁদুয়ারা জমিদারী প্রদান করিয়া সিরাজ সৌকতজঙ্গকে পত্র লিখিয়া পাঠান। শৌকত-জঙ্গ ঐ পত্রের আদেশ অমান্য করিয়া এইরূপ লিখিলেন যে, "আমি বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদারি সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া জাহাঙ্গীর নগরে যাইয়া বাস কর।" পত্র পাইবা মাত্র সিরাজ পূর্ণিয়া আক্রমণ জন্য সেনাপতি মোহনলালকে সৈন্যসহ প্রেরণ করেন এবং নিজে মনিহারির নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করেন। সৌকতজঙ্গ এই সংবাদ পাইয়া তদীয় সৈন্য-সামন্ত ও সেনাপতি শ্যামসুন্দর সমভিব্যাহারে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। সৈন্যগণ সেনাপতি সৌকতজঙ্গের আজ্ঞামত বিপক্ষ সৈন্যা-ভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল- কিন্তু সম্মুখে একটী পঙ্কপূর্ণ বিল পার হইতে সৈন্যগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। বিপক্ষ সৈন্যেরা ইত্যবসরে তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইল, অবশেষে শৌকতজঙ্গের সেনাপতির মৃত্যু হওয়ায় সৈন্যেরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সৌকতজঙ্গ যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তীপৃষ্ঠে ছিলেন। দৈববশে বিপক্ষের গোলাতে সৌকতজঙ্গ মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হন এবং তাহাতেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়। এই যুদ্ধ মনিহারি ঘাটের পূর্ব্ব বলদিয়া বাড়ী নামক স্থানে ঘটিয়াছিল। সৌকতজঙ্গ নয় মাস মাত্র রাজত্ব করেন। যুদ্ধে জয়লাভ হইলে সিরাজের আজ্ঞামত মোহনলাল পূর্ণিয়া নগরে আগমন করেন এবং কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়া তাঁহার পুত্রকে পূর্ণিয়ার নায়েবের পদে নিযুক্ত করিয়া সিরাজের নিকট ফিরিয়া যান। মোহনলালের প্রত্যাবর্ত্তনের পর হাজির আলি খাঁ সৌকতজঙ্গের দেওয়ান অচলসিংহের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মোহনলালের পুত্রকে বন্দী করেন ও স্বয়ং পূর্ণিয়ার ফৌজদার হয়েন। মীরজাফর বাঙ্গালার নবাবের পদে অভিষিক্ত হইয়া হাজির আলি খাঁকে পদচ্যুত করিবার জন্য খাদিম হোসেন খাঁকে পূর্ণিয়ার ফৌজদার পদে নিযুক্ত করিয়া সৈন্যসহ পূর্ণিয়া প্রেরণ করেন। হাজিরালি খাদিম হোসেনের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া

পূর্ণিয়া হইতে পলায়ন করেন এবং খাদিমহোসেন নির্ব্বিঘ্নে পূর্ণিয়ার শাসন-ভার গ্রহণ করেন। মীরজাফর দ্বিতীয়বার সুবাদার হইলে মীর কাশিমের সহ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। খাদিমহোসেন মীরজাফর সাহায্যে সৈন্য সহ পাটনা গমন করেন। এই অবসরে মীরকাশিম সের আলি খাঁকে পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সৈফ খাঁর দ্বিতীয় পুত্র সেপাহাদারজঙ্গ যিনি মীর কাশিমের আশ্রয়ে থাকিয়া সামান্য জীবিকা দ্বারা কালাতিপাত করিতেছিলেন, এই সুযোগে মীর-জাফরের নিকট পূর্ণিয়ার ফৌজদারের সনন্দ লইয়া পূর্ণিয়া গমন করেন। ইহাঁর পিতা সৈফ খাঁ পূর্ণিয়ার ফৌজদার ছিলেন; এই সূত্রে তথায় ইনি অল্পায়াসে এবং অনতিবিলম্বেই সকলের বিশেষ পরিচিত হন। সকল কর্ম্মচারিরা সের আলিকে পদচ্যুত করিয়া সেপাহাদারজঙ্গকে পূর্ণিয়ার শাসনভার প্রদান করেন। মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র বাঙ্গালার সুবাদার হন। মণি বেগম তাঁহার অবিভাবিকা ছিলেন। ঐ সময়ে মহম্মদ রেজা খাঁ সরকারের তাবৎ কার্য্য পরিচালন করিতেন। পূর্ণিয়ার রাজস্ব অধিক বাকি হওয়ায় কলিকাতার মন্ত্রী সভার আদেশ মত সেপাহা-দারজঙ্গকে ১২০০০৲ বার হাজার টাকা বাৎসরিক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তৎ-পদে রায় সুচেৎ সিংহকে নিযুক্ত করেন। এক বৎসর মধ্যে রজি উদ্দিন-মহম্মদ খাঁ ও মহম্মদ আলি খাঁর হস্তে পূর্ণিয়ার শাসনভার অর্পিত হয়। এই সময় ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি ভার প্রাপ্ত হন এবং ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ডিউকারেল সাহেবকে পূর্ণিয়া জেলার রাজস্ব বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিয়োজিত করেন।
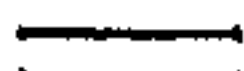
অষ্টম অধ্যায়।

পূর্ব্ববিভাগ—সুরজাপুর পরগণা।—খাগড়া।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, নবাব অস্তওয়াল খাঁর জনৈক উমরাও মহম্মদ সইদ রেজা রাজস্ব আদায়ের জন্য সুরজাপুরের কাননগু নিযুক্ত হয়েন। এ সময় কৃষ্ণগঞ্জের উত্তরস্থিত কুতবগড় নেপালীদের হস্তে ছিল। ইহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। নেপালীরা রাজস্ব আদায়ের বড় বিঘ্ন জন্মাইত। নেপালীদের দুরীভূত করিতে না পারিলে রাজস্ব আদায়ের সুবিধা হইবে না নিশ্চয় করিয়া সইদ রেজা নেপালীদের সহিত যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। কিন্তু নিজের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা নেপালীদের সৈন্যসংখ্যা অনেক অধিক এবং নেপালীরা কুতবগড়ের মধ্যে সংরক্ষিত থাকায় সহসা তাহাদের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। পর্ব্বোপলক্ষে নেপালী সৈন্যগণ একদিন রাত্রে আমোদে মাতোয়ারা র'হিয়াছে দেখিয়া সইদ রেজা অন্ধকারে সুবিধা পাইয়া অনেকগুলি গরু ও মহিষের শৃঙ্গে জলন্ত মশাল বাঁধিয়া কুতবগড়ের অভিমুখে ছাড়িয়া দেন। শৃঙ্গে জলন্ত মশাল থাকায় গো মহিষেরা উর্দ্ধশ্বাসে দুর্গাভিমুখে ছুটিতে থাকে। দুর হইতে নেপালীরা অসংখ্য শত্রুসৈন্য দুর্গাভিমুখে আসিতেছে ভাবিয়া গোলমালে যেমন দুর্গ হইতে বাহিরে আইসে অমনি সইদ রেজার সৈন্যগণ অলক্ষে অস্ত্রের কার্য্য আরম্ভ করে। গোলমালে অন্ধকারে দিশেহারা হইয়া নেপালীরা পলায়ন করিলে সইদ রেজা সসৈন্যে মোরঙ্গ পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হয়েন এবং রাত্রি প্রভাত সময়ে মুরমালা নামক স্থানে উভয় সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ হয় (১৬৭১) এই যুদ্ধে সইদ রেজার জয় হয়। এই যুদ্ধের পর সইদ রেজা তিতুলিয়া পর্য্যন্ত মহানন্দার পূর্ব্বপার্শ্বস্থ তাবৎ ভূভাগ সুরজাপুর পরগণার অন্তর্ভূত করেন।

নেপালীদিগকে দুরীভূত করিয়া রাজ্যের সীমা বৃদ্ধির পুরস্কার স্বরূপ ১৬৭৩ খ্রীঃ অব্দে বাদসাহের নিকট হইতে ফারমান প্রাপ্ত হন। এবং এই সময় হইতে বাদসাহ আলমগীরের নামানুসারে কুতুবগঞ্জের নাম আলমগঞ্জ হয়। ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে রাজস্বের নূতন বন্দোবস্তের সময় পুর্ণিয়ার নবাব সইফ খাঁ সইদ রেজা

জামাতা সইদ নুর মহম্মদকে সুরজাপুরের কাননগুর পদে নিযুক্ত করেন। নুর মহম্মদের পর তাঁহার পুত্র মহম্মদ মসাউদ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন ও পরে তাঁহার জামাতা সইদ মহম্মদ সৈয়দ সুরজাপুরের কাননগু হন। মহম্মদ সৈয়দের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মহম্মদ জলিল পিতৃসম্পত্তিতে অধিকারী হইয়া সরকারের দেয় রাজস্ব প্রদান না করায় পূর্ণিয়ার নবাব সৌলতজঙ্গ কৈফিয়ৎ দিবার জন্য মহম্মদ জলিলকে ডাকাইয়া পাঠান। মহম্মদ জলিল পূর্ণিয়ায় পৌঁছিলে নবাব সৌলতজঙ্গ তাঁহাকে রাজস্ব আদায় না করা পর্য্যন্ত সুরজাপুরে প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন না, এরূপ আদেশ প্রদান করেন। নবাবের এই আদেশে মর্ম্মাহত হইয়া মহম্মদ জলিল আত্মহত্যা করেন।* মহম্মদ জলিলের পুত্রদ্বয় গোলাম হাসন ও গোলাম হোসেন সুরজাপুর হইতে পলায়ন করিয়া দিনাজপুরের রাজা রামচন্দ্র রায়ের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে অবস্থিতি কালে এই বালকদ্বয়কে সেখানকার সকলে রাজা হাসন ও রাজা হোসেন বলিত। এই জন্য বোধ হয় খাগড়ার নবাবদিগকে অদ্যাপি নবাব রাজা বলিয়া থাকে।

১৭৫৬ সালে পূর্ণিয়ার নবাব সকতজঙ্গ বলদিয়া বাড়ীর যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে পূর্ণিয়ায় যে বিষম বিশৃঙ্খল ঘটে সেই সুযোগে রাজা রামচন্দ্রের সাহায্যে গোলাম হাসন পৈতৃক জমীদারী পুনঃ হস্তগত করেন। ইহাঁর পুত্র সইদ ফকির উদ্দিন হোসেন ১৭৯০ খৃঃ অব্দের দশশালা বন্দোবস্তের সময় ইংরাজ কোম্পানির সহিত বন্দোবস্ত করিয়া সুরজাপুর পরগণার জমীদারী বজায় রাখেন।

এই বন্দোবস্তের পর ফকির উদ্দীন হোসেন সুরজাপুর হইতে আপন বাস উঠাইয়া খাগড়ায় দেউড়ি নির্ম্মাণ করেন। ইনি কি হিন্দু কি মুসলমান উভয়েরই প্রিয় ছিলেন। হিন্দু প্রজাদিগের সন্তোষার্থে ইনি আপন দেউড়ীতে দুর্গোৎসব করাইতেন। ইনিই কৃষ্ণগঞ্জের নামকরণ করেন। এরূপ কথিত আছে যে, একদা এক হিন্দু সন্ন্যাসী কুতবগঞ্জে পৌঁছিয়া বিশ্রামার্থ স্থান অন্বেষণ করিয়া অবগত হইলেন যে, এ স্থানের সকলেই মুসলমান। স্থানের নাম কুতবগঞ্জ নদীর নাম রমজান এবং এখানকার জমীদারও মুসলমান। সুতরাং এখানে হিন্দুর পক্ষে জলগ্রহণ করা অবিধেয়। এই বিবেচনা করিয়া

---

* সাইর উল মুতাক্ষরীণ নামক পার্শী পুস্তক ২২৪ পৃষ্ঠা।

ক্ষুৎপিপাসা শ্রমান্বিত সন্ন্যাসী স্থান পরিত্যাগ করিয়া গমনোদ্যত হইলেন। ফকির উদ্দীন হোসেন এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সন্ন্যাসীকে সাদরে আপন দেউড়ীতে আনাইয়া বিশ্রামার্থ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় ফকির উদ্দীন হোসেন কুতবগঞ্জের কয়েক বিঘা জমী দেবত্তর করিয়া দিয়া তথায় হিন্দু দেবালয় স্থাপনের জন্য একটী মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন ও স্থানের নাম কৃষ্ণগঞ্জ রাখিলেন। তদবধি কুতবগঞ্জ কৃষ্ণগঞ্জ নামে অভিহিত হইল।

ফকির উদ্দীন হোসেনের বংশধরেরা অদ্যাবধি খাগড়ায় বিদ্যমান আছেন। ফকির উদ্দীন হোসেনের প্রপৌত্র নবাব সৈয়দ আতা হোসেন মুর্শিদাবাদের নবাব নিজামের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু গোঁসাই দাস দত্তের যত্নে ও উৎসাহে প্রজাদিগের উন্নতির জন্য ইনি খাগড়ায় একটী বাৎসরিক মেলা বসান। প্রতি বৎসর পৌষমাসে উহার অধিবেশন হয়। ১৮৯১ সালে নবাব আতাহোসেন দুই নাবালগ পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলে খাগড়ার জমীদারী ইষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হয়। এক্ষণকার ঐ ইষ্টেটের ম্যানেজার মীঃ রোণ্ট সাহেব অতি দক্ষতার সহিত সমস্ত জমীদারী কার্য্য চালাইতেছেন। মান্যবর রোণ্ট সাহেব খাগড়ার অনেক শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে খাগড়া জঙ্গলাবৃত ও হিংস্র জন্তুর আবাস ছিল, এক্ষণে রোণ্ট সাহেবের উদ্যোগে ও পরিশ্রমে তাহা অতি সুদৃশ্য ক্ষুদ্র নগরে পরিণত হইয়াছে। হাট, বাজার, পান্থনিবাস, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও নর্সরী উদ্যান রোণ্ট সাহেবের নাম এতদঞ্চলে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

নবম অধ্যায়।

উত্তর বিভাগ ফতেপুর, সিংহিয়া, পোয়াখালি।

রাজা মহিপালেরর রাজত্ব সময় পূর্ণিয়ার উত্তর পূর্ব্ব মোরঙ্গের কিয়দংশ পাল রাজাদের অধিকারে ছিল। সেন রাজারা গৌড় অধিকার করিলেও মগধে পাল রাজারাই রাজত্ব করিতেন এবং বাঙ্গালা ও বিহারের কোন কোন স্থান মগধ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল। রাজা মহীপাল বৈশ্য জাতি ছিলেন। সেই সময় হইতে বৈশ্যদের এই দেশে আবাস ভূমি হয়। এই জেলার কোন কোন স্থানে সদ্গোপ জাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ব্রজরাজ নন্দ ও বৃষভানু বৈশ্য জাতি ছিলেন।* গোপালন বৃত্তিহেতু ইহাদের গোপ আখ্যা হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণ ইহার প্রমাণ স্বরূপ।

ইহাদের কুলুজির পুস্তক দেখিলে আরও জানা যায় যে, ইহারা পূর্ব্বকুল ও পশ্চিমকুল এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বাণিজ্য ও কৃষি কার্য্যের সুবিধার জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে বাঙ্গালা দেশে আসিয়া ভাগীরথী ও দামোদর নদের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পারে বাস করেন। যাঁহারা পূর্ব্বকূলে বাস করেন তাঁহারা পূর্ব্বকুল এবং যাঁহারা পশ্চিম তীরে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা পশ্চিমকুল নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বকুলের কুলীনদিগের উপাধি সুরনিয়োগী, বিশ্বাস, পাল ও রায়। পশ্চিমকুলের কুলীনদিগের উপাধি সিংহ, রায় ও কোঙর।

---

*বৃষভানোশ্চ বৈশ্যস্য সা চ কন্যা বভূব হ।
সার্দ্ধং রায়ান বৈশ্যেন তৎসম্বন্ধং চকার সঃ ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণীয় প্রকৃতি খণ্ডধৃত বচনম্।
বৃষভানু পুরীরাজো বৃষভানুর্ম্মহাশয়ঃ।
বৈশ্যঃ সদস্তঃ করণঃ কুলীনঃ কৃষ্ণদৈবতঃ ॥

চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, অশোকের রাজ্যত্বকালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপীড়নে অনেক ব্রাহ্মণ মগধ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পৌণ্ড্র রাজ্যের অধিকার ভুক্ত পূর্ণিয়া জেলায় আসিয়া বাস করেন, কেবল মাত্র যে ব্রাহ্মণেরাই আসিয়াছিলেন তাহা নহে, তৎসমভিব্যাহারে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতিরা আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। আর পূর্ণিয়া জেলার কতকাংশ মিথিলার অন্তর্গত ছিল, ঐ সময়ে নরপতি পালের পূর্ব্ব পুরুষেরা সংস্কার সম্পন্ন বৈশ্য ছিলেন এবং মিথিলা রাজ্যে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে নরপতি পাল রাজা মহিপালের সামন্ত রাজপদে অভিসিক্ত হইয়া বৈদিক সংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই বংশীয়েরা সংস্কার বিহীন হইয়াছেন, আর এই বংশের ক্রিয়া কলাপ সমস্ত মিথিলা দেশ প্রচলিত মিতাক্ষরা মতে হইয়া আসিতেছে। রাজা মহীপাল বহিঃপ্রদেশ শাসন জন্য যে চারি জন সামন্ত-রাজ নিয়োজিত করেন, তম্মধ্যে ধরাপতি পাল ও নরপতি পাল উত্তর প্রদেশের শাসন-ভার প্রাপ্ত হন। ধরাপতি পাল কুশী নদীর পূর্ব্ব কানকাই নদীতীরে রাজধানী স্থাপন করেন। অনেক দিন হইল তাঁহার বংশ লোপ হইয়াছে।

নরপতি পাল মহানন্দা নদীর তীরে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার নির্ম্মিত একটী গড়ের ভগ্নাবশেষ তাঁতপোয়ার নিকট অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ইহাকে লোকে মহীপালের গড় বলিয়া থাকে। মহীপাল রাজা ছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার নামে ঐ গড়ের নাম করণ করা হইয়াছিল। নরপতির পুত্র মহিদাস পাল. মহিদাসের পুত্র ক্ষিতিপতি, ক্ষিতিপতির দুই পুত্র, গৌরীপতি ও গঙ্গাপতি, গঙ্গাপতির পুত্র শ্রীহরি ও জয়হরি পাল। গণপতির পুত্র অনন্ত পাল ও রামদাস পাল, রামদাসের পুত্র শিবদাস, শিবদাসের পুত্র লক্ষ্মীপাল। ভারতবর্ষ মুসলমানগণের অধিকৃত হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বা তৎসমকালে ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ নেপালে প্রবিষ্ট হইয়া মগর, গুরুঙ্গ ও জিমদার নামধেয় তত্রত্য অনার্য্যদিগের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতঃ পার্ব্বত্য জাতিদিগকে আপনাদিগের ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহারা রাজ্য বিস্তার মানসে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হয় এবং পাল নৃপতির সামন্তরাজ রামদাস পালকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সমগ্র মোরঙ্গ রাজ্য অধিকার করেন। খ্রীষ্টের ১৬০০ শতাব্দির প্রারম্ভে লক্ষ্মীপতি

পাল নামে এক ব্যক্তি এই কোঙার সদ্গোপ সামন্তরাজবংশীয় মোরঙ্গের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলার উত্তর পূর্ব্বাংশে আসিয়া নেপালাধিপতির শরণাপন্ন হন এবং এই স্থানে বাস করেন। লক্ষ্মীপতির তিন পুত্র, গোপাল, শ্যাম ও দয়াল; তন্মধ্যে দয়াল নিঃসন্তান ছিলেন।

শ্যামসুন্দরের বংশ লোপ হইয়াছে। গোপাল নেপালাধিপতির সামন্তরাজপদে নিয়োজিত হইয়া সিংহ উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি এই বংশীয়েরা সিংহ বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। গোপালের পুত্র ভাগ্যবান। ভাগ্যবানের তিন পুত্র, প্রথম বংশীধর, দ্বিতীয় লালগোপাল, তৃতীয় মহাদেব; লালগোপালের পুত্র দুঃখ হরণ। মহাদেবের বংশ লোপ হইয়াছে। বংশীধরের তিনপুত্র, বাদল, গরীব ও দণ্ডধর। বাদল নিঃসন্তান ছিলেন। মোরঙ্গের রাজা মানধাতা সেন গরীব সিংহকে ফতেপুর পরগণার কাননগু পদে নিয়োজিত করিয়া নেপালাধিপতির লাল মোহরের সনন্দ প্রদান করেন। খৃষ্টীয় ১৭৩৮ শতাব্দিতে পুর্ণিয়ার ফৌজদার নবাব সৈফ খাঁ মহানন্দার পশ্চিম তাবত ভুভাগ অধিকার করিয়া গরীব সিংহকে পুর্ব্বপদে নিযুক্ত করিয়া এক খানি সনন্দ প্রদান করেন।* পরে রাজস্ব বাকী

---

*মহম্মদ শাহ বাদশাহ গাজী খানেজাদ সয়েফজঙ্গ সয়েফ খান বাহাদুর অমল হাল ও ইস্তক বাল চৌধুরিয়ান ও মকদ্দমান ও রেয়ায়ান ও মজারয়ান জমহুর সুকনে অমুম পরগণা ফতেহপুর সিংহিয়া থানা মঝেলা তপ্পে ঢাকপাড়া ওগৈরাহ সরহদ মোরঙ্গ বদানন্দ, চুখিদমক্ত কাসুনগোয় পরগণা মজকুর বৈইজত সার গরীব সিংহ কাননগোয় বমৌজিব সনন্দ রাজা মানধাতা সেন মোকরর আস্ত। লেহাজা খিদমত মজবুর বদস্তুর সাবেক মিন ইবতেদায় ১১৪৬ মুলকি অমল সরকার নিজ বরনাম বুরদা হসব জমন বাহাল ও বরকরার দাশতে—শুদ কে লোবাজিম ও মরাশিম খিদমত মজবুরা দকিকা আজ দকায়েক হরম হোসইয়ারি গয়ের মরঈ বগুজারদ ও সেরাশতে কাগজ মোয়াফেক জাবেতা ও কানুন করার ওয়াকে নিগাহদারদ। সারায়েত দৌলত খাহয়াহি সরকার বজা আরাদ। কে বা এস খোশ খিদমতী উ বজহুর রসদ জমিয়ে আমলা ও ফেয়ালা পরগণা মস্তর মোমীয়ালেহারা কাসুনগোয় মুস্তকিল দানিস্তা আজ

হওয়ায় পুর্ণিয়ার ফৌজদার নবাব রজিউদ্দীন মহম্মদ খাঁ তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করেন এবং ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ঐ কারাগারে তাঁহার মৃত্যু হয়। গরীব সিংহের মৃত্যুর পর তদীয় দ্বিতীয়া পত্নী প্রাণবতী পতির পাদুকা সহ চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। গরীব সিংহের পাঁচ পুত্র। প্রথম হরি সিংহ, দ্বিতীয় জয় সিংহ, তৃতীয় ভাউ সিংহ, চতুর্থ রণসিংহ, পঞ্চম অচল সিংহ। অচল সিংহ সাধ্বী প্রাণবতীর গর্ভজাত। জ্যেষ্ঠ হরি সিংহ পিতার মৃত্যুর পর ফতেপুর পরগণার কাননগুয়ের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুর্ণিয়ার নবাবের অধীনে থাকিয়া সুচারুরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি ভারপ্রাপ্ত হওয়ার পর ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডিউকেরল সাহেবের নিকট ঐ পরগণা ইজারা লইয়াছিলেন। এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ফতেপুর ও পোয়াখালি দুই পরগণায় বিভক্ত হয়। পোয়াখালি পরগণা কোম্পানীর নিকট ১৭৭০৶৹ আনা রাজস্ব দিবার সর্ত্তে বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। ঐ সময় খানাবাড়ী নামক স্থানে শ্রীশ্রী৺গোবিন্দ জীউর পাষাণময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে হরি সিংহ বার্দ্ধক্য বশতঃ আপনার নাম ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সেরেস্তা হইতে খারিজ করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শুভকরণ সিংহের নাম কালেক্টরী সেরেস্তায় জারি করিয়া সমস্ত কার্য্যভার পুত্রকে দিয়া পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যুর পর শুভকরণ সিংহ পরগণা পোয়াখালির জমিদার হইয়া পোয়াখালি ছাড়া আরও অন্যান্য অনেক বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন (১৮১২ খৃষ্টাব্দে।) শুভকরণ সিংহ, পুহপৎ সিংহ ও রঙ্গলাল সিংহ নামে দুই পুত্র এবং ইন্দ্রাবতী ও জ্ঞানবতী নামে দুই কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন এবং মৃত্যুর অব্যবহিত কালে অমৃতলাল মজুমদার ও ব্রজলাল চৌধুরী নামে তদীয় ভাগিনেয়দ্বয়কে সম্পত্তির অলি নিযুক্ত করিয়া যান। ব্রজলাল

ও দস্তখত মশারণ আলেহে বার কাগজ তওয়ামীর ও ওয়াসেলাত সেয়াহা ও গৈরাহ বদস্তুর সাবিক মশার সোরস্তা দস্তুর কাননগোয় আকমাল ও সায়ের ও কাহ চরাই ও গৈরাহ মওয়াফিক মামুল মি গিরফতাবাসদ দরজঁ বাব তাকীদ দানিস্তা হস্বঅল মনস্তুর বআমল আরন্দ তখল্লফ ও ইনহেরাফ নওরজন্দ তারিখদহম শহর জমাদি অল সানি সন ২২ জলুস ওয়ালা তহরীর এয়াকত।

চৌধুরী ও অমৃতলাল মজুমদার নাবালক পুহপৎ সিংহ ও রঙ্গলাল সিংহের অছি নিযুক্ত হইয়া সুচারুরূপে বিষয় কার্য্য সম্পাদন করেন। পুহপৎ সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এবং ১৮২০ খৃষ্টাব্দে সহধর্ম্মিণী পদ্মাবতী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঙ্গলালকে অতুল দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় যৌবনেই জীবলীলা সম্বরণ করেন। পুহপৎ সিংহের পরলোকপ্রাপ্তির পর রঙ্গলাল সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী হন এবং কার্য্যভার গ্রহণের ছয় বৎসর পরেই ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে কৌমারেই কালের করাল কবলে পতিত হন। রঙ্গলালের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতৃজায়া পদ্মাবতী কিছুকাল সমস্ত সম্পত্তি ভোগদখল করেন।

গরীব সিংহের দ্বিতীয় পুত্র জয়সিংহ অপুত্রক ছিলেন। ভাউসিংহের চারি পুত্র; চন্দন, অজীব, নির্ভয় এবং তুলসী। রণসিংহের সহন, মোহন, শীতল ও অর্জ্জুন সিংহ নামে চারি পুত্র এবং অচল সিংহের দুলাল, মহাতাপ, পশুপতি, বসন্ত, রমণ ও জগন্নাথ নামে ছয় পুত্র ছিল। হরি সিংহের অপর চারি ভ্রাতা কেবল চারি খানি গ্রাম মাত্র তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট প্রাপ্ত হইয়া সামান্য আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কালে, হরি সিংহের বংশ লোপ হইলে তদীয় অপর তিন ভ্রাতার বংশধরগণ পুহপৎ ও রঙ্গলাল সিংহ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া রাণী পদ্মাবতীর উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের আর্থিক অবস্থা তাদৃশ উন্নত না থাকায় আদালতের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক পৈতৃক সম্পত্তি হস্তগত করিবার উদ্দেশে মেহেনগাঁ নিবাসী দেওয়ান পান্না উল্লার সাহায্য প্রার্থী হইলেন। পান্না উল্লা মোকদ্দমার ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হইলে পরগণে পোয়াখালির এক চতুর্থাংশ মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে দিবার অঙ্গীকারে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাণী পদ্মাবতীর বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদ প্রভিন্সিয়াল কোর্টে মোকদ্দমা * রুজু করেন। এই মোকদ্দমা যথাক্রমে পূর্ণিয়া জজকোর্ট হইতে কলিকাতা হাইকোর্ট এবং তদনন্তর বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অনুসারে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে পদ্মাবতী তদীয় সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন এবং ভাউ সিংহ, রণসিংহ ও অচল সিংহের পুত্রগণ উক্ত সম্পত্তির প্রকৃত

---

* Case No. 168 of 1835 Purnea Judge Court.

উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হইয়া ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘকালের পর পরগণা পোয়াখালির দখল প্রাপ্ত হন। ১২৩৬ বঙ্গাব্দে মোকর্দ্দমা শেষ হয় এবং অবশেষে মামলা মোকর্দ্দমা ব্যপদেশে সম্পত্তির অধিকাংশ বিক্রয় হইয়া যায়। এক্ষণে পোয়াখালি পরগণার এক চতুর্থাংশ দেওয়ান পান্নাউল্লার বংশধরেরা, এক চতুর্থাংশের কিছু অধিক মিষ্টার ফরবিশ ও এক চতুর্থাংশের অধিক বাবু পৃথিচাঁদ লাল চৌধুরী ও অবশিষ্টাংশ হরি সিংহের তিন ভ্রাতার বংশধরদিগের মধ্যে খানাবাড়ী নিবাসী হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ খাস দখল স্বত্বে ও বাবু শেখলাল সিংহ, বাবু ভবানন্দ সিংহ, বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহ বাবু জগৎচন্দ্রসিংহ ও হলধরনারায়ণ সিংহ পত্তনি বন্দোবস্ত স্বত্বে ভোগ করিতেছেন।

মোকর্দ্দমা ব্যপদেশে রাণী পদ্মাবতী সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলে পর তাহার ভরণ পোষণের জন্য আদালত হইতে পোয়াখালি পরগণার আয়ের উপর ১২০০০ টাকা বাৎসরিক ধার্য্য হইয়াছিল। তদ্দারা তিনি অনেক সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন এবং গোবিন্দজীর পাষাণবিগ্রহ খানাবাড়ী হইতে নারিকেলবাড়ী গ্রামে আনয়ন করিয়া তথায় মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ আজীবনকাল পূজাসেবা অতিথি সৎকার ইত্যাদি কার্য্য নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহ করেন। এবং ১২০০ টাকার সম্পত্তি দেবসেবা ও অতিথি সৎকারে নিয়োজিত করতঃ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে অনিত্য-সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করেন।

তুলসী সিংহ দুইবার দার পরিগ্রহ করেন। তিনি পরগণা পোয়াখালির এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হন। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে নিয়ামৎসিংহ, দ্বিতীয়ার গর্ভে তিন কন্যা সুধা, দুর্গা ও গৌরী। তুলসি সিংহ ১২৫৯ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসের পূর্ণমাসিতে স্বর্গারোহণ করেন। নিয়ামৎ সিংহের পুত্র গণেশলাল সিংহ। নিয়ামৎ সিংহ পিতার বর্ত্তমানে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। গণেশলাল সিংহ পিতামহের মৃত্যুর পর ২০ বৎসর বিষয় ভোগ করিয়া ১২৭৪ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে ৪২ বৎসর বয়ঃক্রমে পাঁচটী কন্যা এবং শেখলাল সিংহ, ভবানন্দ সিংহ ও মধুসুদন সিংহ নামে তিন পুত্র রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। শেখলাল সিংহ খাড়ুদহ নিবাসী ৺ব্রজলাল চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ছয়াবতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পুত্র বলদেবপ্রসাদ সিংহ ও সাতকড়ি সিংহ। শেখলাল সিংহ কৃষ্ণগঞ্জ সব-

ডিবিজনের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, লোকালবোর্ডের ও পূর্ণিয়ার ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের মেম্বর। ১১৬০ বঙ্গাব্দে শেখলাল সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষণে ইহাঁর বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসর।

ভবানন্দ সিংহ তিনবার দার পরিগ্রহ করেন। প্রথমা নিঃসন্তান; দ্বিতীয়া পত্নী মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত গুড়ানিবাসী ব্রজসুন্দর রায় চৌধুরীর কন্যা মন্দাকিনী। মন্দাকিনী এক পুত্র সচ্চিদানন্দ ও এক কন্যা কৈলাসবাসিনিকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ভবানন্দের তৃতীয়া পত্নী সমেশ্বর নিবাসী মণিরাজ চৌধুরির কন্যা শ্রীমতী পার্ব্বতি। ইহার গর্ভজাত দুই পুত্র যশোদানন্দ, জগদানন্দ ও এক কন্যা শ্রীমতি চিত্রবালা সহ বর্ত্তমান আছেন। ১২৬৫ বঙ্গাব্দে ভবানন্দ সিংহের জন্ম হয়। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর।

মধুসূদন সিংহ ১২৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি তিনবার দার পরিগ্রহ করেন। প্রথমা পত্নী খাড়দহের খ্যাতনামা জমিদার সূর্য্যমণি চৌধুরাণীর কন্যা মান্যবতী। মধুসূদন সিংহের দ্বিতীয়া পত্নী গোঁমাই নিবাসী ৺অক্ষয়চন্দ্র কোঙারের কন্যা উলাঙ্গিনি। রাধারাণী, শরৎসুন্দরি, ইন্দুমতি ও চিন্তামণি নামে চারি কন্যা রাখিয়া পতি বর্ত্তমানে উলাঙ্গিনি পরলোক গমন করেন। মাতার মৃত্যুর কিছুকাল পরেই চিন্তামণির মৃত্যু হয়। মধুসূদনের তৃতীয়া পত্নী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দীর্ঘনগর নিবাসী ৺কালীদাস রায়ের কন্যা শ্রীমতি চিন্ময়ী। মধুসূদন সিংহ তৃতীয়া পত্নী চিন্ময়ীর গর্ভাবস্থায় ১৩০৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে তাঁহার রাজ-কুমার নামে একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া কয়েক মাস পরে কালগ্রাসে পতিত হয়। মধুসূদন সিংহের বিধবা পত্নী চিন্ময়ী এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন। মধুসূদন সিংহ জিমুতবাহন ব্রতকথা সংগ্রহ করিয়া ১৩০৬ সালে মুদ্রিত করান। তাঁহার কৃত মধুবাগ খাড়দহ গ্রামে তাঁহার কীর্ত্তিস্বরূপ বর্ত্তমান আছে। তিনি কৃষ্ণগঞ্জ সবডিবিজনের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও লোকালবোর্ডের মেম্বর ছিলেন।

দশম অধ্যায়।

ইংরাজ অধিকার।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে ইংরাজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী সুবা বাঙ্গালা বিহারের দেওয়ানী ভার প্রাপ্ত হইয়া সরকার পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করেন এবং ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে মিঃ ডিউকেরল সাহেবকে পূর্ণিয়ার রাজস্ব কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। ইনি বর্ত্তমান পূর্ণিয়া সহরের নিকট রামবাগে থাকিয়া সমগ্র সরকার পূর্ণিয়ার রাজস্ব বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এ সময় মালদহ জেলার অধিকাংশ পূর্ণিয়া সরকারের অন্তর্গত ছিল, পরে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে মহারাণীর রাজত্বভার গ্রহণ করার অনেক পরে মালদহ স্বতন্ত্র জেলা হইলে পূর্ণিয়া জেলার বর্ত্তমান সীমা নিরূপিত হয়।

মিঃ ডিউকেরল সাহেব কেবল রাজস্ব বিভাগের কার্য্য করিতেন। বিচার বিভাগের কার্য্য সুবাদার নবাবের অধীনে মুসলমান কাজী দ্বারা সম্পাদিত হইত। ডিউকেরল সাহেবের সময় আগা মহম্মদ আলি খাঁ নামক এক ব্যক্তি বিচার বিভাগে সমগ্র পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন। ইনি মুসলমানগণের শেষ কাজী। ১৭৭৭ খ্রীঃ অব্দে মুসলমান কাজীর বিচার উঠিয়া যাইলে ইংরাজ কোম্পানী বিচার কার্য্যের জন্য আপনাদিগের মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন। এ সময় মিঃ হেটলী সাহেব রাজস্ব বিভাগের কার্য্যের জন্য পূর্ণিয়ার কালেক্টর ও মিঃ কোলব্রুক সাহেব বিচার বিভাগে পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন।

১৭৯০ খ্রীঃ অব্দে দশশালা বন্দোবস্তের সময় মিঃ হেটলী ও মিঃ কোলব্রুক সাহেব সমগ্র পূর্ণিয়া জেলাকে ২৯টী পরগণা ও অন্যূন ১৬২৯ মহলে (এষ্টেট) বিভক্ত করেন। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইয়া যায়। ১৬২৯ মহলের মধ্যে ২৮টী গবর্ণমেণ্টের খাস, ২৩০টী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহল ও অবশিষ্ট ১৩৭১টী জাইগীর ও তালুক। এই বন্দোবস্তে খাস মহল ছাড়া গবর্ণ-

মেণ্টের রাজস্ব ১৪,০৪,২১২ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। ইহার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহল ১৩,৫৪.৪৮৮ টাকা ও অবশিষ্ট জাইগীরে ৪৯,৭২৪ টাকা।

দশশালা বন্দোবস্তে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পূর্ণিয়ায় জমীদারী প্রাপ্ত হয়েন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে হরি সিংহ ফতেপুর পরগণার জমীদার ও কাননগোয় ছিলেন। এই বন্দোবস্তের সময় উক্ত পরগণার কর রাণী ইন্দ্রাবতীর সহিত ডাক হইয়া অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া যায়। অবশেষে ফতেপুর ও পয়োয়াখালি দুই অংশে বিভক্ত হইয়া ফতেপুর রাণী ইন্দ্রাবতী ও পোয়াখালি হরি সিংহ প্রাপ্ত হন।

(১) মোহিনীর রাণী ইন্দ্রাবতী—সুলতানপুর, শ্রীপুর, ফতেপুরসিঙ্গিয়া, হাবেলী ও কাটীহার পরগণার জমীদারী প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত পরগণা সমুদয়ে প্রায় ২ হাজার বর্গ মাইল হইবে। পরে ১৮৫০ খৃঃ অব্দে ইহার জমিদারী বিক্রয় হইলে মুর্শিদাবাদ নিবাসী রায় প্রতাপসিংহ (প্রসিদ্ধ ধনপৎ ও লছমীপৎ সিংহের পিতা) হাবেলি, ফতেপুরসিঙ্গিয়া ও কাটীহার পরগণা এবং পূর্ণিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার মিঃ ফর্ব্বস সাহেব সুলতানপুর পরগণা ক্রয় করেন। পরে ১৮৯৩ সালে কলিকাতার সার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর ফতেপুর-সিঙ্গিয়া পরগণার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। হাবেলি পরগণা এক্ষণে বাবু পৃথীচাঁদ লাল চৌধুরীর দখলে আছে।

(২) দ্বারবঙ্গের রাজা মধুসিংহ ধরমপুর পরগণা প্রাপ্ত হয়েন। ইহার পরিমাণ প্রায় ১১০০ বর্গ মাইল।

(৩) সইদ ফকির উদ্দিন হোসেন—সুরজাপুর পরগণার জমিদার হয়েন। ইহার পরিমাণ প্রায় ৭২৬ বর্গ মাইল। পরে এই পরগণার কিয়দংশ পূর্ণিয়ার ৺বাবু ধর্ম্মচাঁদ লাল খরিদ করেন।

(৪) বকাউল্লা—বাড়োর পরগণা প্রাপ্ত হয়েন। পরিমাণ ৩০০ বর্গ মাইল। এই পরগণার কতক অংশ ৺ধর্ম্মচাঁদ বাবুর পিতা ৺কছেদলাল চৌধুরী খরিদ করেন।

(৫) শিবনাথ ও গৌরীনাথ—তাজপুর পরগণা প্রাপ্ত হয়েন। পরিমাণ ১৮০ বর্গ মাইল। এই পরগণার কিয়দংশ ৺ধর্ম্মচাঁদ বাবুর পুত্র বাবু পৃথীচাঁদ লাল চৌধুরীর দখলে আছে।

(৬) হরি সিংহ—গোরাখালি পরগণা প্রাপ্ত হয়েন। পরিমাণ ১২৭ মাইল। এই পরগণার অধিকাংশ মিষ্টার ফার্বিশ ও পৃথীচাঁদ বাবুর দখলে আছে কেবল সামান্যাংশ হরি সিংহের বংশীয়দের হস্তে রহিয়াছে।

(৭) দুলার সিংহ—টেরাখরদা পরগণা প্রাপ্ত হয়েন। পরিমাণ ৭৬ বর্গ মাইল।

রাজ কার্য্য সৌকার্য্যার্থে পূর্ণিয়া এক্ষণে ২৯টী পরগণায় বিভক্ত। বিচার কার্য্যের সুবিধার জন্য পূর্ণিয়া জেলায় ১৩টী থানা আছে, যথা—পূর্ণিয়া সদর, ধামধাহা, গোন্দয়ারা, সইফগঞ্জ (কাটীহার), কদরা, বলরামপুর, আমোর-কসবা, আরেরিয়া, রাণীগঞ্জ, মাটীয়ারি; কৃষ্ণগঞ্জ ও কালিয়াগঞ্জ। প্রথম ৭টী থানা লইয়া পূর্ণিয়ার সদর কাছারি, আর আরেরিয়া, রাণীগঞ্জ ও মাটীয়ারি থানা লইয়া আরেরিয়া মহকুমা হইয়াছে। এবং কালিয়াগঞ্জ, কৃষ্ণগঞ্জ ও বাহাদুরগঞ্জ থানা লইয়া কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমা।

(১) পূর্ণিয়া সদর :—বর্ত্তমান পূর্ণিয়া সহর হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে মধুবাণী নামক স্থানে সদর ফৌজদারী ও দেওয়ানী কাছারী স্থাপিত আছে। সদরে জেলার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, জয়েন্ট ও য়্যাসিসটেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবগণ বাস করেন। পুলিশ বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবও সদরে থাকেন। পূর্ণিয়া সদরের এলাকা প্রায় ২৬০০ বর্গ মাইল। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ। ছোট বড় অনেক জমিদারগণ সদরে থাকেন। অনেকেই এক বা ততোধিক পরগণার অধীশ্বর। সদরের জমিদারগণের মধ্যে মিঃ আর্থার ফরবিস্ সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত দ্বারবঙ্গের মহারাজারও জমিদারী পূর্ণিয়া জেলায় আছে। পূর্ণিয়া সদরে গবর্ণমেণ্টের একটী গুরখা সৈন্য নির্ব্বাচনের স্থান আছে [Recruiting Depot.] প্রতি বৎসর শীতকালে এক জন সৈনিক এখানে সৈন্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। পূর্ণিয়া সদরেরর এলাকার মধ্যে পূর্ণিয়া সহর ব্যতীত অনেক ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গ্রাম ও নগর আছে। তন্মধ্যে কাটীহার, নবাবগঞ্জ, বারসই ও কসবা উল্লেখযোগ্য।

কাটীহার—পূর্ণিয়া সহর হইতে প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে কালীকুশির পূর্ব্ব-পারে কাটীহার অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম সইফগঞ্জ। খৃষ্টের অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পূর্ণিয়ার নবাব সইফ খাঁ এই নগর সংস্থাপন করেন। এজন্য

তাঁহার নামানুসারে ইহাকে সইফগঞ্জ বলা হয়। ইহা বহুকাল হইতে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধানস্থান। এখানে অনেক ইউরোপীয়গণের নীল কুঠী আছে। গম, যব, অড়হর কলাই, ধান্য ও মটর প্রভৃতি শস্য বহু পরিমাণে এখান হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। এ জেলায় রেলওয়ে প্রস্তুত হইবার পর হইতে ইহার অধিবাসীর সংখ্যাও অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। এখানে রেলওয়ের ট্রাফিক আফিস, ঔষধালয় ও বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হওয়াতে ইহা এজেলার প্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছে ও বহু ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকায় ইহা সুশোভিত হইয়াছে। আজকাল কাটীহার পূর্ণিয়ার একটী প্রধান চৌকি। এখানে এক জন মুন্সেফ থাকিয়া দেওয়ানি মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি করেন। কথিত আছে মুসলমান নবাবদিগের শাসন- সময়ে এই সইফগঞ্জ পূর্ণিয়া সহরের দ্বার স্বরূপ ছিল। আততায়ীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এখানে নবাবদিগের সেনা নিবেশ ছিল। তাহারা পূর্ণিয়াকে বহিশত্রু হইতে রক্ষা করিত এজন্য ইহাকে পূর্ণিয়া সরকারের কটীর হার স্বরূপ বলা হইত। রেলওয়ে প্রস্তুত হওয়ার পর হইতে এই সইফগঞ্জ "কটীহার" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আদালতের কাগজপত্রে এখনও সইফগঞ্জ নাম লিখিতে দেখা যায়।

নবাবগঞ্জ :—মনিহারি ঘাট হইতে প্রায় ৬ মাইল পূর্ব্বে এবং কাটিহার হইতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত, ইহা আজকাল সইফগঞ্জ থানার এলাকাধিন। ইহা ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রধান স্থান। পাট, মটর ও সর্ষপ এখানকার প্রধান রপ্তানি। নবাবগঞ্জ কাটীহার অপেক্ষা প্রাচিন নগর। কথিত আছে, পূর্ণিয়ার মুসলমান শাসনকর্ত্তা রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া বাদসাহের নিকট প্রেরণ করিলে পথিমধ্যে তাহা দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। দস্যুদিগকে ধৃত করিতে না পারাতে, বাদসাহ ভবিষ্যতে এরূপ লুণ্ঠন না হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে এখানে গ্রাম সন্নিবেশ করিতে মনস্থ করেন এবং এরূপ ঘোষণা করেন যে, যে কেহ দণ্ডিত অপরাধী পূর্ণিয়ার প্রান্তরে আসিয়া বাস করিবে, বাদসাহ তাহাদের দণ্ড ও অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ইহাতে অনেক লোক আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। উক্ত আদেশ ঘোষণার পর এই গ্রাম প্রথম সংস্থাপিত হয়। নবাবের আদেশে গ্রাম হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম নবাবগঞ্জ।

হয়। নবাবগঞ্জে পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই নবাবগঞ্জের অনতিদূরে বলদিবাড়ীর যুদ্ধক্ষেত্র। এই স্থানে ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলা ও সকতজঙ্গের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। নবাবগঞ্জের সাপ্তাহিক হাট উল্লেখযোগ্য। প্রতি হাটেই অনেকদূর এমন কি মালদহ, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থান হইতে লোকজন সমাগত হইয়া থাকে।

বারসোই—কাটীহার হইতে প্রায় ৩৫ মাইল পূর্ব্বে মহানন্দার পূর্ব্বতীরে বারসোই অবস্থিত। ইহা আসাম, বিহার রেলপথ ও কৃষ্ণগঞ্জ রেলপথের সন্ধি Junction ষ্টেশন। এখানকার হাট এজেলার সকল হাট অপেক্ষা বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ। প্রতি বুধবারে হাট বসিয়া থাকে। মহানন্দার তীরে অবস্থিত বলিয়া এখানকার ব্যবসায় বাণিজ্য বহুদূর ব্যাপী। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্যবসায়ীগণ ক্রয় বিক্রয় করিতে আইসে। পাট, ধান, পান, মৎস্য, সর্ষপ ও রেশম এখানকার প্রধান রপ্তানী। এরূপ প্রবাদ আছে যে, মালদহ হইতে কতিপয় লোক বর্গীর হাঙ্গামার সময় বর্ত্তমান বারসোইএর নিকট আবাদপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করে। ইহারা এই হাটের প্রথম সূত্রপাত করেন, এজন্য তখনকার লোক ইহাকে "বারসইয়ের হাট" বলিত। সেই হইতে ইহার নাম বারসোই হইয়াছে। এই হাট এক্ষণে বাড়োর পরগণার জমীদারের সম্পত্তি হইয়াছে।

কসবা—কসবা এক্ষণে ঐ প্রদেশের মধ্যে একটী বিশেষ সমৃদ্ধশালী ও প্রধান বাণিজ্য স্থান। এ গ্রামে অধিকাংশই শুঁড়ি জাতির বাস। এখানে অনুান এক হাজার ঢেঁকি আছে। এখানকার ইতর জাতীয় সমস্ত স্ত্রী-পুরুষই ব্যবসায় করিয়া থাকে, তণ্ডুল প্রস্তুতই ইহাদিগের প্রধান ব্যবসায়। এবং কসবা চাউল ও ধান্যের প্রধাণ বাণিজ্য স্থান। কলিকাতার ন্যায় দ্রব্যাদির দর নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কসবার লোকসংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। এখানে ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিস, ঔষধালয়, বিদ্যালয় এবং আসাম, বিহার রেলওয়ের একটী ষ্টেশন আছে। কসবা পুর্ণিয়া সদর হইতে ৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত। পুর্ণিয়া সদরের উত্তর অংশ পেয়ারা গাছ ও দক্ষিণ অংশ কুল গাছের বৃহৎ জঙ্গলে পরিবৃত ; এত অধিক কুলগাছ ও পেয়ারা গাছ এক স্থানে দেখা যায় না।

আরেরিয়া :—আরেরিয়া, রাণীগঞ্জ ও মেটিয়ারি এই তিনটী থানা লইয়া ১৮৬৪ সালের আগষ্ট মাসে আরেরিয়া মহকুমা স্থাপিত হয়। এখানে একজন সবডিবিজন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ও একজন মুনসেফ থাকেন। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কাছারী প্রায় ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এই মহকুমার পরিমাণ ফল প্রায় ১১০০ বর্গ মাইল। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪৩০ হাজার। মিঃ ওয়ার সাহেব এখানকার সর্ব্ব প্রথম সবডিবিজন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আইসেন। কলাই, তামাক, ধান্য ও সর্ষপ এখানকার প্রধান রপ্তানি শস্য। এই মহকুমায় অধিকাংশ মৈথিল ব্রাহ্মণগণের বাস। এরেরিয়ার প্রায় ১০।১২ ক্রোশ উত্তর কুশী নদীতীরে মহর্ষি শমিকের আশ্রম ছিল। রাণীগঞ্জ একটী প্রধান বাণিজ্য-স্থান। পুর্ণিয়া সদরের উত্তর সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া নেপালরাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত এই মহকুমা বিস্তৃত।

কৃষ্ণগঞ্জ :—এই মহকুমা পূর্ণিয়া সদর ও এরেরিয়ার পূর্ব্ব হইতে দিনাজপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কৃষ্ণগঞ্জ, বাহাদুরগঞ্জ ও কালিয়াগঞ্জ এই তিনটী থানা লইয়া ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এই মহকুমা স্থাপিত হয়। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ১৩৪৬ বর্গ মাইল। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৬৫১ হাজার। এ মহকুমার হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক। মিঃ পেরি সাহেব প্রথম এখানে সবডিবিজন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণগঞ্জ রমজান নদীর তীরে অবস্থিত। দেওয়ানি ও ফৌজদারী কাছারী সেখান হইতে প্রায় ৩ মাইল। অন্যান্য সবডিবিজন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যে বাবু গেঁদাই দাস দত্ত ও বাবু রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের নাম উল্লেখযোগ্য।

সমাপ্ত।

উন্মাদ রোগের

অব্যর্থ মহৌষধ।

হিমালয়বাসী জনেক সন্ন্যাসী কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে ১২৯৬ সালে এই অব্যর্থ পরম কল্যাণকর মহৌষধ দান করেন। প্রায় বিশ বৎসরাবধি বহু উন্মাদ রোগীকে আমি এই সন্ন্যাসী-লব্ধ মহৌষধ ব্যবহার করাইয়া আসিতেছি এবং আশানুরূপ ফল পাইয়াছি। ইহাতে কোন প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য বা পারার সংস্রব নাই। ইহা একটী ধাতব পদার্থ এবং হিমালয় পর্ব্বত-জাত গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। এই ঔষধ প্রস্তুত জন্য বহুমূল্য ধাতব পদার্থ ক্রয় করা এবং পর্ব্বত-জাত গাছ গাছড়া প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা বহু আয়াস ও ব্যয় সাপেক্ষ হেতু এই সন্ন্যাসী প্রদত্ত মহৌষধের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম। যত দীর্ঘকালেরই উন্মাদ হউক না কেন, ইহা ব্যবহারে ঈশ্বর কৃপায় অবশ্যই আরোগ্য হইবে; তবে রোগ দীর্ঘকালের হইলে ঔষধও দীর্ঘকাল ব্যবহার করিতে হইবে। বটিকা, চূর্ণ, নস্য ও তৈল ব্যবহার করিতে হয়।

ঔষধ ব্যবহার বিধি।

প্রথম দিবসে রোগীর সর্দ্দি করাইবার জন্য নস্য চারি আনা পরিমাণ দুই তোলা জল সহ পাষাণপাত্রে মর্দ্দন করিয়া পিচ-কারী দ্বারা বা যে কোন উপায়ে নাসারন্ধ্রে এরূপে প্রবেশ করা-ইয়া দিবে যাহাতে ঐ নস্য মস্তিষ্ক স্পর্শ করিয়া মুখ দিয়া নির্গত

হয়। নস্য গ্রহণের ২।১ ঘণ্টা পরেই সর্দ্দি হইবে। যদি না হয় তবে প্রথমবার নস্য গ্রহণের ২।৩ ঘণ্টা পর রোগীকে পুনরায় নস্য গ্রহণ করাইতে হইবে। ২য় বারও যদি রোগীর সর্দ্দি না হয়, তবে ৩য় বার ঐরূপে নস্য গ্রহণ করাইবে। অতিরিক্ত সর্দ্দি হইয়া যদি কষ্টকর বোধ হয়, তবে খাঁটি সরিসার তৈল নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে।

সর্দ্দি হইবার একদিন পর বটিকা ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। দ্বিতীয় দিবসে প্রাতে ১নং বটিকা ও ২নং বটিকা এক একটী করিয়া একত্রে আধ ছটাক শীতল জল সহ পাষাণপাত্রে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে এবং বৈকালে ১নং বটিকা ও ৩নং বটিকা আধ ছটাক শীতল জলে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে। এইরূপে এক সপ্তাহ কাল সেবন করিবে। রোগ আরোগ্য হইলে সুস্থ অবস্থায় কিছুকালের জন্য তৈল ও চূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে। ইহা ব্যবহার করিলে ঐ রোগে পুনরায় আক্রমণ করিবার আশঙ্কা থাকিবে না। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে রোগী সবল ও সুস্থকায় হইবে। এক ছটাক দুগ্ধ সহ আধ তোলা চূর্ণ এক মাস সেবন করিতে হইবে। ৭ দিবস কাল বটিকা ব্যবহার করিয়া যদি বিশেষ কিছু ফল না পাওয়া যায় তবে আমাকে সংবাদ দিবেন। আমি রোগীর অবস্থা দেখিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিব।

ঔষধের মূল্য।

নস্য তিন মাত্রা ১॥০ টাকা। ১নং বটিকা প্রতি সপ্তাহ ২৲ টাকা, ২নং ও ৩নং বটিকা প্রতি সপ্তাহ ১৲ টাকা হিসাবে। তৈল প্রতি সের ৩২৲ টাকা। চূর্ণ প্রতি সপ্তাহ এক টাকা।

অপথ্য।

মৎস্য, মাংস, দধি, দুগ্ধ, সর্ব্বপ্রকার গুড় ও মিষ্টান্ন ও মিষ্ট দ্রব্য। শাক, অম্ল, কলাই দাইল, স্নান, স্ত্রীসহকার রাত্রি জাগরণ, চিন্তা, রাগ, অতিরিক্ত পরিশ্রম। তামাক ভিন্ন সর্ব্ব-প্রকার মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ।

পথ্য।

দিবসে কলাই ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার দাইল ও রোগীর ব্যবহারোপযোগী তরকারী ও অন্ন, ঘৃত। রাত্রে লুচি, রুটী, চাউল ভাজা, মুড়ি, চিড়া ভাজা। সুপক্ক ফল, মুল ইত্যাদি।

শ্রীভবানন্দ সিংহ।
থানাবাড়ী পোঃ
জেলা (পূর্ণিয়া।)